ভবদহের গল্প এবং অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভবদহের গল্প এবং অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

গত বছর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোকে সংকলিত করে 'ভবদহের গল্প এবং অন্যান্য' প্রকাশিত হল। ঠিক কী কারণ জানা নেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই কলামগুলো অনেকেই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন। শুধুমাত্র তাদের আগ্রহের কারণেই আমি ২০০৬ সালে প্রকাশিত লেখাগুলোকে এই বইটিতে একত্র করার চেষ্টা করেছি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৪ জানুয়ারি ২০০৭
বনানী ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

নববর্ষের উপহার / ১১
নতুন বাংলাদেশে নতুন বাংলা ভাষা / ১৮
তুমি সর্প হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো.. / ২৫
স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা / ৩২
বৈশাখের প্রথম দিন / ৩৮
একজন বীরশ্রেষ্ঠর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন / ৪৪
আমরা যারা শিক্ষক / ৫১
একটি নির্বাচনী মেনিফেস্টো / ৫৮
একজন ভাইস চ্যান্সেলর / ৬৫
লেখাপড়া নিয়ে ছেলেখেলা / ৭৩
এইচএসসি পরীক্ষা ফিজিওথেরাপীস্ট এবং অন্যান্য / ৮১
যশোরের ভবদহের গল্প / ৮৯
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ / ৯৮
একজন অসুখী রাষ্ট্রপতি / ১০৪
আমাদের উৎসব আমাদের অধিকার /১১১
গণতন্ত্রের জন্ম-প্রক্রিয়া / ১১৮
আমি শুধু একটা জিনিসই বুঝি / ১২১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নববর্ষের উপহার

কিছুদিন আগে বিল গেটস সস্ত্রীক বাংলাদেশ থেকে ঘুরে গেছেন। অন্যদের কথা জানি না, আমি যেদিন প্রথম খবর পেলাম বিল গেটস বাংলাদেশে আসছেন, আমার বুকটা এক ধরনের আশঙ্কায় ছাঁৎ করে উঠেছিল। আমি জানি বিল গেটস বাংলাদেশে আসছেন সেটা নিয়ে সারা দেশে উত্তেজনা, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার গাড়িটা পর্যন্ত বিল গেটসকে ব্যবহার করতে ছেড়ে দিলেন— তাহলে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল কেন?

কারণটা খুব সহজ। আমরা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে দেশের জন্য কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখছি, দেশে অসংখ্য মানুষ তার জন্য চেষ্টা করছে। তার জন্য দরকার কম্পিউটার, কম্পিউটারের সঙ্গে দরকার তার অপারেটিং সিস্টেম, তার সফটওয়্যার। আমরা কম্পিউটারটা টাকা-পয়সা দিয়ে কিনি কিন্তু দেশের শতকরা প্রায় একশ' ভাগ অপারেটিং সিস্টেম আর সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার হচ্ছে বেআইনি কপি, যার প্রায় পুরোটাই হচ্ছে বিল গেটসের কোম্পানি মাইক্রোসফটের। বিল গেটস বাংলাদেশে এসে সবকিছু দেখে যদি ঘোষণা করতেন, এই দেশে কেউ বেআইনিভাবে তার অপারেটিং সিস্টেম আর তার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে না, বলা যায় আক্ষরিক অর্থে রাতারাতি বাংলাদেশের পুরো তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো ধসে পড়তো। এটা আমাদের জন্য খুব লজ্জার কথা যে, আমরা পুরো দেশের মানুষ বেআইনি সফটওয়্যার দিয়ে দেশ চালাচ্ছি, সোজা বাংলায় বলা যায় আমরা প্রায় সবাই একটি করে চোর!

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কিন্তু চোর হয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা ইচ্ছে করলেই মাথা উঁচু করে সসম্মানে থাকতে পারি। কোনো একটি বিচিত্র কারণে সেটি ঘটে উঠছে না। যারা তথ্যপ্রযুক্তির জগতে খোঁজখবর রাখেন তারা ব্যাপারটি জানেন, সাধারণ মানুষ নাও জানতে পারেন।

আমার মনে আছে, প্রায় একযুগ আগে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম তখন

প্রথম ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে। যত কম্পিউটার আছে তার সবগুলোর অপারেটিং সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার আসছে বিল গেটসের মাইক্রোসফট কোম্পানি থেকে। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রথম ধারণাটি এসেছিল জিরক্সের প্যালো আলটোর একটি ল্যাবরেটরি থেকে (পি.এ.আর.সি.), প্রথমে ম্যাকিন্টশ কম্পিউটারে এবং পরে প্রচলিত পিসিতে সেই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়। এক সময় দেখা যায় যে, বলতে গেলে সব কম্পিউটারেই মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম। আমার মনে আছে, বেল কমিউনিকেশন্স ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে রাজা উজির মারতে মারতে আমি প্রায় সময়েই সবাইকে জিজ্ঞেস করতাম, 'এটা কেমন করে হয় যে সারা পৃথিবীতে সকল কম্পিউটারে শুধু মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম? এটা তো ভালো হতে পারে না! অন্যেরা নতুন সলিউশান নিয়ে এগিয়ে আসছে না কেন?' লাঞ্চ খেতে খেতে সবাই মাথা চুলকাত, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না।

তখন সবার অগোচরে খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। আমার ধারণা সেটা শুরু হয়েছে মাইক্রোসফট কোম্পানি এবং তার মালিক বিল গেটসের ব্যবসায়িক আগ্রাসন দেখে। সারা পৃথিবীর কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের দর্শন অনুভব করতে লাগলেন। তারা ভাবতে লাগলেন যে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেরকম সবার অধিকার, তার জন্য আমরা যেরকম মূল্য ধরে দিই না, সফটওয়্যারের বেলাতেও সেটা হওয়া দরকার। সেই ভাবনা থেকে এসেছে নতুন একটা শব্দ, যার নাম হচ্ছে, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (open source software) এবং যার অর্থ সফটওয়্যারের মধ্যে গোপন কিছু নেই; শুধু যে গোপন কিছু নেই তা নয়, সেটা বিতরণ করা হবে বিনামূল্যে। সফটওয়্যার নিয়ে ব্যবসা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো সবার এতে সমান অধিকার- এই চমৎকার দর্শনটি নিয়ে সারা পৃথিবীর অসংখ্য কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ মিলে তৈরি করলেন বর্তমানকালের সবচেয়ে টেকসই অপারেটিং সিস্টেম 'লিনাক্স'। শুধু যে লিনাক্স তৈরি হলো তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে অন্যসব সফটওয়ার, সারা পৃথিবীর সবার মধ্যে সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। মহাথির মোহাম্মদ যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি এই দেশের মানুষকে বলে গিয়েছিলেন, 'তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার লিনাক্সনির্ভর ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে চলে যাও।' তার এই উপদেশের পেছনে অনেক যুক্তি ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিয়ে লিনাক্সনির্ভর ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে চলে গিয়েছে, অনেক উন্নত দেশ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না নিলেও তাদের সব কাজকর্ম করছে মাইক্রোসফটের ওপর নির্ভর না করে।

এ দেশের মানুষের প্রায় সবাই বেআইনি চোরাই সফটওয়্যার ব্যবহার করছে কিন্তু ইচ্ছে করলেই তারা মাইক্রোসফটের চোরাই অপারেটিং সিস্টেম থেকে মুক্তি পেতে পারে। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সফটওয়্যার কোনো অংশেই মাইক্রোসফটের চোরাই সফটওয়্যার থেকে খারাপ নয়। যারা এই বিষয়গুলোর বিশেষজ্ঞ তারা দাবি করেন, অনেকগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো। এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায়, এই মুহূর্তে আমরা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারগুলো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে যা যা করতে পারি, ওপেন সোর্সের সফটওয়্যার ব্যবহার করে তার সবকিছু করতে পারব। এবং সেটা আমরা করব মাথা উঁচু করে, সসম্মানে! কোনো একটা কোম্পানির সফটওয়্যার চুরি করে ব্যবহার করার অসম্মানটুকু আমাদের আর সহ্য করতে হবে না।

২

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সারা পৃথিবীর অসংখ্য কম্পিউটার বিজ্ঞনী, গণিতবিদ, শখের তথ্যপ্রযুক্তিবিদের পুরোপুরি স্বেচ্ছাশ্রমে গড়ে উঠেছে। (শোনা যায় মাইক্রোসফট তার হটমেইলের সার্ভারেও নাকি নিজেদের সফটওয়্যার ব্যবহার না করে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে)। আমাদের দেশের অনেকিছু তরুণও ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের জন্য কাজ করছে। তারা আমাদের দেশের উপযোগী করে এই সফটওয়্যারগুলো প্রস্তুত করেছে। আমি যতদূর জানি, পুরোপুরি বাংলায় একটা অপারেটিং সিস্টেম দাঁড় করানোর কাজ চলছে। এতদিন সবাই ধরেই নিয়েছিল কম্পিউটার ব্যবহার করার আগে ইংরেজি শিখতে হবে, কিন্তু পুরোপুরি বাংলা অপারেটিং সিস্টেম দাঁড় করানো হলে হঠাৎ করে দেশের অল্প শিক্ষিত মানুষও কম্পিউটারের সুযোগ গ্রহণ শুরু করতে পারবে। এই মুহূর্তে আমার হাতে বাংলাদেশের ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে, সেরকম যে কটি প্রতিষ্ঠানের নাম আছে সেগুলো লেখাটার পেছনে সংযুক্ত করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় দেশের পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানানো উচিত, বলতে গেলে সবার অগোচরে তারা দেশের জন্য একটা খুব বড় কাজ করে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

৩

বিল গেটস বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাওয়ার পরদিন আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ খুলেছিলাম। বাংলাদেশে তিনি কী করেছেন, কী বলেছেন সেটা জানার আগ্রহ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খবরের কাগজ দেখে আমার খুব আশাভঙ্গ হয়েছে, সেখানে বড় বড় ছবি ছাপা হয়েছে যে, বিল গেটস আর তার স্ত্রী ভাঙা কুঁড়েঘরে হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দেখছেন!

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ভাবমূর্তি রয়েছে। একটি ভাবমূর্তি হচ্ছে দুর্নীতির ভাবমূর্তি। পঞ্চমবারের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশের গ্লানিটুকু আমাদের সহ্য করতে হয়েছে, যদিও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের দুর্নীতি করার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। দেশের খুব ছোট একটা অংশের ভয়াবহ দুর্নীতির জন্য পুরো দেশকে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর সামনে এরকম লজ্জা পেতে হচ্ছে। যারা এই দুর্নীতি করছে তাদের বেশির ভাগকেই আমরা চিনি। আমার ধারণা, এখন তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করার সময় হয়েছে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাবমূর্তিটি হচ্ছে জঙ্গি মৌলবাদীর ভাবমূর্তি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের মোটামুটি খোলাখুলি সহযোগিতা দিয়ে এটা বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। এখন এটা কী পর্যায়ে গিয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যখন অবস্থাটুকু সহ্যসীমার বাইরে চলে গিয়েছিল, তখন এক ধরনের ধরপাকড় শুরু হয়েছিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্য হলেও আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো এই জঙ্গি মৌলবাদীদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইদানীং সরকারের বড় বড় মানুষের কথা শুনে মনে হচ্ছে সেটি সত্যি নয়, তারা ঠিক আগের মতোই বলতে শুরু করেছেন, সব বোমাবাজির পেছনে রয়েছে বিরোধীদল! যার অর্থ জঙ্গি বোমাবাজদের ধরা এবং এর মূলোৎপাটন নিয়ে আমরা যে আশা করেছিলাম সেটা সত্যি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি নাটক সবার বিনোদনের জন্য মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তৃতীয় একটি রূপ রয়েছে, সেটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত, বন্যাপীড়িত, মঙ্গায় আক্রান্ত, হতদরিদ্র মানুষের রূপ। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য এবং যতদিন আমরা এ সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে না পারব ততদিন এর সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। পশ্চিমা দেশ আমাদের এই রূপটি দেখতে পছন্দ করে, হতদরিদ্র,

BanglaBook.org

কথা ও, রোগাক্রান্ত মানুষকে দেখতে চাইলেই তারা বাংলাদেশে চলে আসে। টাইম নিউজউইকে যখন বাংলাদেশের একটি শিশুর ছবি ছাপাতে হয়, তখন তারা খুঁজে খুঁজে একটা রোগাক্রান্ত অপুষ্ট শিশুকে খুঁজে বের করে। এটা তাদের ভেতরে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে, সেখান থেকে টেনে বের করার উপায় নেই।

কিন্তু আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, যখন আমি দেখতে পাই আমরা নিজেরাই যখন বাংলাদেশের একটি রূপ কাউকে দেখাতে চাই তখন খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষকে খুঁজে বের করি। বিল গেটস পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী মানুষ সে কথাটা সত্যি, কিন্তু বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই মানুষটি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মানুষটি যখন বাংলাদেশে আসে তখন তাকে একটি হতদরিদ্র মানুষের কুঁড়েঘরে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে তার দারিদ্রকে প্রদর্শন না করে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে কিংবা কোনো একটা স্কুল বা কলেজে নিয়ে গেলে কী ক্ষতি হতো? আমরা জানি, আমাদের অনেক সমস্যা কিন্তু আমরা তো সেই সমস্যার কথা বলে কাঁদুনি গেয়ে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না, আমরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। আমাদের সেই ক্ষমতা আছে, সেটি পৃথিবীর সবাইকে বোঝাতে চাই। আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে। বুয়েট নমের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকরাই কি বিল গেটসের সঙ্গে খানিকটা সময় পাওয়ার বেশি অধিকার রাখেন না?

বিল গেটস চলে যাওয়ার পর আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, তার বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্ভবত তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে ছিল না। সেটি ছিল তার এবং তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি ফাউন্ডেশন নিয়ে। যেসব প্রতিষ্ঠানে তারা অর্থ বিনিয়োগ করছেন সেগুলো কী ধরনের মানুষের সেবা করছে, সেটা নিজের চোখে দেখতে এসেছিলেন। বাংলাদেশকে তিনি এখনো তথ্যপ্রযুক্তিতে অবদান রাখতে পারে এরকম দেশ হিসেবে দেখতে প্রস্তুত নন– হতদরিদ্র, রোগাক্রান্ত, অপুষ্ট, দুস্থ মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। আমার খুব কষ্ট হয়, যখন দেখি আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে সেই রূপটিই দেখাই।

বেশ কয়েক বছর আগে জার্মানিতে একবার আমার একটি আন্তর্জাতিক মেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর সব দেশ তাদের প্যাভেলিওন

BanglaBook.org

তৈরি করেছিল। প্রত্যেকটি দেশ– সেটি যত অনগ্রসরই হোক তারা সেখানে নিজেদের আধুনিক এবং বিজ্ঞানমুখী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, বাংলাদেশ ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের প্যাভেলিওনে ছিল একটা রিকশা, একটা ঢেঁকি, একটা পালকি এবং সাজানো ছিল একটা কুঁড়েঘর হিসেবে। আমি মনে করি না এটি আমাদের বাংলাদেশের সঠিক রূপ। আমাদের দেশের লাখ লাখ ছেলেমেয়ে এখন পড়াশোনা করছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে শিক্ষিত হচ্ছে, আমাদের এই নতুন প্রজন্ম আমাদের দেশকে কী দিতে পারে সে স্বপ্নটুকু হবে আমাদের বাংলাদেশের রূপ। যারা বাংলাদেশের দারিদ্র্য দেখিয়ে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পান, আমি তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। আমি একবারও অস্বীকার করি না, আমাদের দেশে দারিদ্র্য রয়েছে। কিন্তু সেই দারিদ্র্য দূর করতে পারবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমুখী তরুণ প্রজন্ম। রিকশা চালিয়ে, ঢেঁকিতে ধান ছেঁটে, পালকি করে মানুষকে নিয়ে এই দারিদ্র্যে দূর হবে না, তাহলে কেন আমরা পৃথিবীর সামনে এভাবেই নিজেদের দেখাব?

৪

যে দিনটি দিয়ে নববর্ষ শুরু হয় সেই দিনটির আসলে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সেদিন অন্যদিনের মতোই সূর্য ওঠে, দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায়। তবুও এই দিনটাকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি। সারা বছর কেমন গিয়েছে সেটি একবার হলেও ভেবে দেখার চেষ্টা করি। প্রায় সময়েই আবিষ্কার করি বছরটি খুব ভালো যায়নি, তখন আমরা নতুন বছরটি যেন খুব ভালোভাবে যায় তার একটা পরিকল্পনা করি। প্রায় সময়েই সেই পরিকল্পনা হয় খুব ব্যক্তিগত। যারা সিগারেট খান তারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন, ডায়াবেটিস রোগীরা সকালে হাঁটাহাঁটি করার পরিকল্পনা করেন, ফাঁকিবাজ ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছরে নতুনভাবে পড়াশোনা করার ঘোষণা দেয়। সবসময়ই যে এই প্রতিজ্ঞা বা পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হয় তা নয়, কিন্তু তারপরও নতুন বছরের নতুন পরিকল্পনার একটা গুরুত্ব রয়েছে। বছরের একটি দিন আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেয়, নববর্ষে সেটাই হয়তো আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।

মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বপ্নের বাইরে দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে। যে স্বপ্ন আমরা স্পর্শ করতে পারি সেই স্বপ্ন দেখতে দোষ কী? নতুন যে

BanglaBook.org

বছরটি আসছে সে বছর বাংলাদেশের সব কম্পিউটার ব্যবহারকারী মানুষ চুরি করে আনা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ব্যবহার বন্ধ করে ওপেন সোর্সের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে শুরু করবে সেটা কী খুব চমৎকার একটা স্বপ্ন হতে পারে না? বিশেষ করে এই স্বপ্নটি যখন অর্জন করা খুব সহজ।

মাথা উঁচু করে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিসে আছে? বাংলাদেশে যত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ল্যাবরেটরি আছে, সবগুলো কি এই বছরটাতে চোরাই সফটওয়্যার পরিত্যাগ করে সারা পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা শুরু করতে পারে না? যত সরকারি-বেসরকারি অফিস আছে, সবাই কি তাদের বেআইনি সফটওয়্যারের পরিবর্তে ১০০ ভাগ আইনসম্মত সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে না? যারা কম্পিউটারের ব্যবসা করেন, তারা কম্পিউটারে বেআইনি সফটওয়্যার পুরে না দিয়ে ওপেন সোর্স সফটওয়্যারসহ মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারেন না?

সবচেয়ে চমৎকার হয়, যদি আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করি যে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো আমরাও আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সব কাজ ওপেন সোর্স সফটওয়্যার দিয়ে করতে চাই, আর সরকার আমাদের জন্য সেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেয়।

একটা জাতিকে নতুন বছরে উপহার দেওয়ার জন্য এর থেকে সুন্দর কি আর কিছু হতে পারে?

বাংলাদেশের ওপেন সোর্সে কাজ করছে সেরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট :

www.ankurbangla.org
www.bios.org.bd
www.ekushey.org

ওপেন সোর্স সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট
www.linux.org.
www.openoffice.org
www.bengalintx.org
www.bdosn.org.
www.mozilla.org

প্রথম আলো
১ জানুয়ারী, ২০০৬

BanglaBook.org

নতুন বাংলাদেশে নতুন বাংলা ভাষা

জন্মের পর থেকে বাংলায় কথা বলছি, কথা শুনছি, তাই এই ভাষাটার যে আমার জীবনে আলাদা কোনো গুরুত্ব আছে সেটা কখনো টের পাইনি। প্রথমবার টের পেয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে যাওয়ার পর, পুরো ইউনিভার্সিটিতে আমি একমাত্র বাংলাদেশের মানুষ। দিনের পর দিন বাংলায় একটা কথা না বলতে পারার যে কী কষ্ট, আমি তখন সেটা প্রথমবার অনুভব করেছিলাম। মাছকে ডাঙায় তুলে ফেললে তাদের কেমন লাগে, সেটা মাছের বাইরে আমার থেকে ভালো করে মনে হয় কেউই জানে না। আমার মনে আছে, তখন একা একা হেঁটে হেঁটে ডর্মিটরিতে ফিরে আসার সময় আমি বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতাম।

বাংলা ভাষার খুঁটিনাটি, তার গঠন, তার রূপ– এই বিষয়গুলো আমি প্রথম আলাদাভাবে লক্ষ্য করেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে বসেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির একজন পিএইচডি ছাত্র বাংলাদেশে আসবে, সে সারা ইউনিভার্সিটি ঘেঁটে আমাকে খুঁজে বের করে আমার কাছে চলে এসেছে বাংলা শেখার জন্য। যে ভাষাটি আমি অনায়াসে বলে ফেলি, সেটা একজন আমেরিকান ছাত্রকে শেখানোর সময় আমাকে প্রথমবার বাংলা বাক্যের গঠনটা ভালো করে বুঝতে হলো। শিক্ষক হিসেবে আমি যাচ্ছেতাই, কিন্তু ছাত্র হিসেবে সেই আমেরিকান ছেলেটি ছিল অসাধারণ, সে আমাকে বার বার বলত, 'তোমাদের ভাষাটি তো অসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত।' কথাটি প্রমাণ করার জন্যই হয়তো দুই সপ্তাহের মাথায় সে বলতে শুরু করল, 'আমি ঢাকা গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে ফোন করবো।' আমার শেখানো বাংলা নিয়ে ছেলেটি একাধিকবার বাংলাদেশ ঘুরে গিয়েছে এবং সব সময়ই এই বিদেশী ছেলেটির আমাদের দেশটির জন্য এক ধরনের মায়া ছিল।

যখন পার্সোনাল কম্পিউটারের চল শুরু হলো, তখন কম্পিউটারে বাংলা

BanglaBook.org

লিখতে গিয়ে আমি দ্বিতীয়বার বাংলা ভাষার এক ধরনের সৌন্দর্য আবিষ্কার করলাম। সে যুগের কম্পিউটারের সীমিত ক্ষমতা, অথচ বাংলায় অসংখ্য যুক্তাক্ষর– প্রথম প্রথম আমার মাথা-খারাপের মতো অবস্থা। বিষয়টার একটু গভীরে গিয়ে আমি হঠাৎ একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম, ক বর্গের শেষ অক্ষর ঙ এবং ঙ-এর সঙ্গে ক বর্গের অক্ষরগুলো যুক্তাক্ষর তৈরি করে। সে রকম আর যুক্তাক্ষর তৈরি করে চ বর্গের অক্ষরের সঙ্গে। ন তৈরি করে ত বর্গের অক্ষরের সঙ্গে। ণ তৈরি করে ট বর্গের অক্ষরের সঙ্গে। ঘণ্টা বানানটি ন দিয়ে (ন+ট), আবার ণ দিয়ে (ণ+ট) হঠাৎ করে সেটি আর মুখস্থ রাখার বিষয় নয়, এটি জানার বিষয়। যারা ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তারা নিশ্চয়ই সেগুলো অনেক আগে থেকেই জানেন। কিন্তু আমার মতো মানুষের জন্য সেটি ছিল বিশাল একটি আবিষ্কার, সেই আবিষ্কারে প্রায় রাজ্য জয় করার মতো আনন্দ। শৈশবে ব্যাকরণ স্যারেরা ব্যাকরণ শেখানোর জন্য কানমলা কিংবা পেটের চামড়া টিপে ধরার মতো পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, খুব একটা লাভ হয়নি, এই বিষয়গুলো শেখালে মনে হয় লাভ হতো।

আরো পরে, যখন আমার ছাত্রেরা বাংলা অনুবাদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন, তখন হঠাৎ করে আরো একটা নতুন জিনিস আমার চোখে পড়ল। ইংরেজিতে কাউকে ভালোবাসার কথা বলতে হলে আমরা বলি 'আই লাভ ইউ', বাংলায় সেটা হয় 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। ইংরেজিতে এ কথাটা এই একভাবেই বলা সম্ভব, শব্দগুলো একটু ওলটপালট করে দিলে 'ইউ লাভ আই' কিংবা 'ইউ আই লাভ' হচ্ছে অর্থহীন কথা। অথচ বাংলায় 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই তিনটি শব্দ সব মিলিয়ে ছয়টি ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজানো যায়। আর সবগুলোই পুরোপুরি শুদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ বাক্য। আমার কথা বিশ্বাস না করলে এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। বাক্যগুলো হলো (১) আমি তোমাকে ভালোবাসি (২) আমি ভালোবাসি তোমাকে (৩) তোমাকে আমি ভালোবাসি (৪) তোমাকে ভালোবাসি আমি (৫) ভালোবাসি আমি তোমাকে এবং (৬) ভালোবাসি তোমাকে আমি! শেষের বাক্যগুলোকে একটু কবিতার ভাষার মতো শোনায় কিন্তু পুরোপুরি শুদ্ধ, গ্রহণযোগ্য বাক্য। বাংলা ভাষা শব্দ ব্যবহারের বেলায় এ রকম অসাধারণ সহনশীল এই বিষয়টা যখন প্রথমবার আমার চোখে পড়েছে, আমি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম! শব্দগুলো যেভাবে খুশি

BanglaBook.org

সাজানো যায় বলেই হয়তো বাংলা ভাষায় ছন্দ মেলানো সোজা। আর আমার মনে হয় এ কারণেই বাঙালি প্রত্যেকটি মানুষই একজন কবি। জীবনে কোনো একটা সময়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করেনি, সে রকম বাঙালি মানুষ আমি এখনো খুঁজে পাইনি।

আমি নিশ্চিত, বাংলা ভাষার মধ্যে এ রকম আরো কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, কাটখোট্টা বিজ্ঞানের মানুষ হয়েছিলাম বলে সেগুলো এখনো চোখে পড়েনি!

আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে হঠাৎ করে এ রকম আরো কোনো একটা নতুন জিনিস চোখে পড়বে আর আমার মনে হবে, আরো একটা রাজ্য বুঝি জয় করে ফেলেছি! নিজের ভাষার মধ্যেই কত আনন্দ।

২

বাংলা ভাষার কাছে আমরা অনেকভাবে ঋণী। বাহান্ন সালে এই ভাষার জন্য ভালোবাসা দিয়েই আমাদের বাংলাদেশের জন্ম-প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল। তাই বাংলা ভাষার ওপর কোনো ধরনের আগ্রাসন শুরু হলেই আমরা এক ধরনের দুর্ভাবনা অনুভব করি। আমার ধারণা, এ মুহূর্তে আগ্রসনটা আসছে আকাশপথে এবং হিন্দি ভাষা হিসেবে। হিন্দি যে ভাষা হিসেবে খুব শক্তিশালী বা হিন্দি কালচার যে খুব ঐতিহ্যবাহী, আমি সে ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নই, কিন্তু টেলিভিশন এবং ভিডিওতে হিন্দি খুব জোরেশোরে আসছে। বাংলাদেশের সব সম্ভ্রান্ত পত্রিকাতে হিন্দি নায়ক-নায়িকাদের খুঁটিনাটি খবর থাকে। কোন হিন্দি সিনেমা বক্স অফিস হিট করেছে, কোনটা করেনি, সেটা খুব গুরুত্ব দিয়ে লেখা হয়। বাংলাদেশের বিলবোর্ডে বাংলাদেশের নায়ক-নয়িকার ছবি নেই, হিন্দি নায়ক-নায়িকারা সে স্থান দখল করে রেখেছে। বহুজাতিক কোম্পানির বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের মেরুদন্ড নিশ্চয়ই নেহাত দুর্বল, যখন এই সিদ্ধান্তগুলো তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তারা মুখবুজে সেটি মেনে নেন কেন?

একটি সময় ছিল, যখন আমি এক ধরনের ছেলেমানুষি অহঙ্কার নিয়ে বলতাম যে আমি কোনো হিন্দি ছবি দেখিনি। আমার সেই গর্বটি চূর্ণ হয়ে গেছে ঢাকা-সিলেটের বাস সার্ভিসের কারণে। রাস্তা ভালো হওয়ার পর অনেক বড় বড় বিলাসবহুল বাস নামানো হয়েছে, সেই বাসগুলোতে টেলিভিশন লাগানো আছে। বাস ছাড়ার পর কোরআন তিলাওয়াত শেষ করামাত্রই টেলিভিশনে হিন্দি সিনেমার

BanglaBook.org

গায়িকারা নাচানাচি শুরু করে দেয়। এভাবে বাসে যাওয়ার সময় আমার চোখের সামনে একটার পর একটা হিন্দি সিনেমা দেখানো হয়েছে, সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আমি চোখ বন্ধ করে থাকার চেষ্টা করেছি, টিস্যু পেপারগুলো পাকিয়ে কানে ঢুকিয়ে শব্দ বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, কোনো লাভ হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোটি টাকার বাস ছুটে যাচ্ছে, তার ভেতরে অসহায় যাত্রী– তাদের জোর করে হিন্দি সিনেমা দেখানো হচ্ছে, এর থেকে উৎকট রসিকতা কি আর কিছু হতে পারে? নিশ্চিতভাবেই কোনো মন্ত্রী, কোনো সংসদ বা তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বিশাল বিত্তশালী মানুষেরা দরিদ্র দেশের এই বিলাসবহুল বাস সার্ভিসগুলোর মালিক। তারা কেউ জানেন না যে একটা মানুষ কী দেখবে, কী শুনবে সেটা সে নিজে ঠিক করবে, তাকে জোর করে কিছু দেখানোর বা শোনানোর অধিকার কারো নেই!

শুধু বাস সার্ভিস কেন, এয়ারপোর্টে গিয়েও দেখেছি, সেখানে হিন্দি চ্যানেলে হিন্দি অনুষ্ঠান হচ্ছে! আমার খুব অবাক লাগে, যখন ভাবি, আমাদের এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে একজন মানুষও নেই, যারা এই বিষয়গুলো লক্ষ করে দেখবে?

আমার ধারণা, এই বিষয়গুলো নিয়ে মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করা দরকার, প্রতিবাদ করলে কখনো কখনো কাজ হয়। যখন একুশে টিভি ছিল, তখন কোনো এক ঈদে তারা ঠিক করেছিল হিন্দি ছবি দেখাবে। আমার মনে আছে, আমরা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে তার প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, এমনিতেই হিন্দি চ্যানেলগুলো আমাদের ড্রয়িংরুমে পাকাপাকিভাবে আসন গেড়ে বসেছে, এখন যদি আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলগুলোও তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে হিন্দি ছবি দেখায় আমরা তাহলে কোথায় যাব? আমার মনে আছে, আমাদের প্রতিবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে একুশে টিভি হিন্দি ছবি দেখানোর পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল। আমাদের দেশে এখন অনেকগুলো টিভি চ্যানেল, আমি যতদূর জানি, তাদের কেউই হিন্দি ছায়াছবি বা অনুষ্ঠানের প্রচার করে না। আমরা আশা করে আছি, কখনো দেখাবে না।

তবে আমরা আমাদের ভাষাকে ভালোবাসি, তাই আমরা হিন্দি ছবি দেখব না, এটা কিন্তু খুব ভালো একটা যুক্তি নয়। যুক্তিটা হওয়া উচিত এ রকম, আমাদের বাংলা ভাষাতে এত চমৎকার চমৎকার অনুষ্ঠান রয়েছে যে আমাদের আর হিন্দি চ্যানেলে যেতে হয় না! যদি সত্যি সত্যি এটা করতে পারি, তাহলে আমি বলব,

BanglaBook.org

আমরা হিন্দি আগ্রাসনকে ঠেকাতে পেরেছি। কাজটি সহজ নয়, হিন্দি ভাষায় বিনোদনের যে ইন্ডাস্ট্রি, সেটি সারা পৃথিবীতে তুলকালাম কাণ্ড করে রাখছে। কাজেই আমাদের যে ধাক্কাটি সহ্য করতে হবে সেটি বিচিত্র কী?

আমার ধারণা, হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের শিল্পী ও কলাকুশলীরা বেশ চমৎকারভাবেই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। দেশে অনেকগুলো টিভি চ্যানেল (আমি সঠিক সংখ্যাটি বলতে পারব না) এবং সব চ্যানেলেই নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, গান, খবর, সাক্ষাৎকার কী নেই! মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে যদি টিভির চ্যানেলগুলোতে চোখ বোলানোর সুযোগ হয়, দেখে বোঝা যায় অনুষ্ঠানের মান, কারিগরি ব্যাপার সবকিছু অনেক বেড়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই– সবাই এখনো একুশে টিভির মতো হওয়ার চেষ্টা করছে।

ইদানীং আরো একটি ব্যাপার আমার খুব ভালো লেগেছে। ক্লোজআপ ওয়ানে প্রতিযোগিতা করে কিছু তরুণ গায়ক-গায়িকা খুঁজে আনা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশে যে গণিত উৎসব হচ্ছে, সেই উৎসবগুলোতে তাদের একজন-দুজন গান গেয়ে গেছে। কী চমৎকার তাদের গানের গলা, কী সুন্দর তাদের কথা বলার ভঙ্গি! আর সবচেয়ে বড় কথা, কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে তারা শতকরা একশ' ভাগ বাঙালি। তাদের গলায় আমাদের নতুন প্রজন্ম যে গান শুনতে চায় সেগুলো দেশের গান, দেশের জন্য ভালোবাসা এবং দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসার গান। আমি খুব আশা করে আছি যে আমাদের দেশের এ রকম ছেলেমেয়েরাই হিন্দি গানের শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করে আনবে।

৩

যেহেতু বাংলা নিয়ে কথা হচ্ছে, আমার মনে হয় এখানে আরো একটি বিষয়ের কথা বলা যায়। সেটি হচ্ছে মোবাইল টেলিফোন এবং মোবাইল টেলিফোনে এসএমএস। আমাদের নতুন প্রজন্ম মোবাইল টেলিফোনে ইংরেজিতে বাংলা লিখতে এমন পারদর্শী হয়ে গেছে, এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, আমি প্রতিবছর ভয়ে ভয়ে থাকি যে হয়তো এই বছরে কোনো একজন মানুষ এই বইমেলায় ইংরেজি অক্ষরে বাংলা লিখে একটা বই বের করে ফেলবে! আজকাল খবরের কাগজের সিংহভাগ এই মোবাইল টেলিফোনগুলো তাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে দখল করে রাখে, কাজেই তাদের সমালোচনা করে কেউ কিছু লিখলে সেটা ছাপা হবে বলে মনে হয় না। এই বিদেশী মোবাইল টেলিফোনগুলো আমাদের দেশ থেকে

BanglaBook.org

পাশ্চাত্যের কত হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার খুব জানার কৌতূহল হয়। অথচ তারা এ দেশের জন্য আলাদা কোনো মোবাইল সেট ডিজাইন করার আগ্রহ দেখাল না, যেখানে একজন খুব সহজে বাংলায় এসএমএস পাঠাতে পারবে! অবশ্যি আমার ধারণা, বিষয়টি তাদের মাথার মধ্যেই নেই, যদি থাকত তাহলে বাংলা গালাগালকে ইংরেজিতে লিখে সারা ঢাকা শহরের বিলবোর্ডে সেটা টাঙিয়ে দিতো না। তারুণ্যের এক ধরনের উচ্ছ্বাস থাকে, আমরা সস্নেহে সেটাকে প্রশ্রয় দিই। কিন্তু বাংলাদেশে মোবাইল টেলিফোনের বিজ্ঞাপনে যে জিনিসটি ঘটছে, সেটা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নয়!

আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মের ওপর আমার অনেক বিশ্বাস। তাদের এ রকম রুচিহীন একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আকর্ষণ করার কথা যারা ভেবে বের করেছেন, তাদের জন্য আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বাংলা ভাষায় বাংলা পড়তে পারে, এই জিনিসই যারা জানে না, তারা আসলে কোন দেশের মানুষ?

ইদানীং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখছি একটি মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি বাংলায় এসএমএস পাঠানোর একটি সুযোগ করে দিচ্ছে। সমাধানটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী, তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে চিন্তা করেই গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। আমি নিশ্চিত, ইংরেজি ভাষায় বাংলা লেখার লজ্জা থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্মরাই আমাদের উদ্ধার করবে।

৪

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শেখার জন্য আমাদের এখনো ইংরেজি ভাষার ওপর নির্ভর করতে হয়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সব ভালো বই ইংরেজিতে। আমরা সেই স্কুল থেকে ইংরেজি শেখা শুরু করেছি, দশ বছর স্কুল এবং দুই বছর কলেজ শেষ করার পর একজন ছাত্র বা ছাত্রীর যথেষ্ট ইংরেজি জানা উচিত, যেন উচ্চশিক্ষায় তাদের কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটছে না। আমরা দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি নিয়ে যেটুকু সমস্যা হয়, তার থেকে অনেক বেশি সমস্যা হয় ইংরেজি ভাষাটাকে নিয়ে। সে কারণে আমি ইংরেজি ভাষাটাকে এখন আর ভাষা হিসেবে দেখি না, এটাকে দেখি একটা টেকনোলজি বা প্রযুক্তি হিসেবে। এই টেকনোলজি একজন যত তাড়াতাড়ি যত ভালোভাবে আয়ত্তে আনতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি সে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শেখা শুরু করতে পারবে।

BanglaBook.org

এটি হচ্ছে উচ্চশিক্ষার সময়। কিন্তু যখন স্কুলে একজন পড়বে তখন সে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখবে সেটা অবশ্যই হতে হবে মাতৃভাষায়। পৃথিবীর যাবতীয় টেক্সট বই আমরা বাংলায় লিখে ফেলতে পারব না। কিন্তু স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য চমৎকার বাংলা টেক্সট বই এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। বইগুলোয় বিষয়বস্তু আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু ভাষা এখনো আড়ষ্ট। বাংলা ভাষার উন্নতি করার জন্য সেটি হবে আমাদের আরেকটি পদক্ষেপ, বাংলা ভাষায় সহজ ও প্রাঞ্জল করে গণিত কিংবা বিজ্ঞান লেখার প্রচলন করা। আমি চেষ্টা করে দেখছি কাজটি সহজ নয়! সহজ নয় বলেই জোরেশোরে শুরু করতে হবে– যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

৫

আধুনিক পৃথিবীতে বাংলা ভাষাকে সম্মান এবং ভালোবাসা দেখানোর দায়িত্ব শুধু কবি-সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদদের নয়, এখন এই দায়িত্ব একই সঙ্গে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের। বিদেশে একটা প্রযুক্তি তৈরি হবে, সেটা আমাদের দেশে বিক্রি হবে এবং আমরা সেটা কিনেই আনন্দে আটখানা হয়ে যাব, তা আমার পছন্দসই নয়। আমার ধারণা, এই দেশের তরুণ প্রযুক্তিবিদরা নিজেরা নতুন প্রযুক্তি তৈরি করতে প্রস্তুত হয়েছে এবং আমরা ধীরে ধীরে সেটা দেখতে শুরু করব। তাই, যখন বিল গেটস বাংলাদেশে আসেন এবং আমাদের দেশের কেউ কেউ বিনীতভাবে তার সিস্টেমে বাংলা ভাষাকে স্থান দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করেন, সেটি আমার একেবারেই ভালো লাগে না। নতুন পৃথিবী হচ্ছে ওপেন সোর্সের পৃথিবী এবং কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের দেশের তরুণেরা সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বসানোর ক্ষমতা রাখে। তারা সেই কাজ শুরু করেছে এবং আমরা কিছুদিনের ভেতরেই তার ফল দেখা শুরু করব।

আমার মনে হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার কবি, সাহিত্যিক, লেখক, ভাষাবিদ কিংবা সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদদেরও আমাদের স্মরণ করা দরকার। সবার অজান্তে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে তারা অনেক সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে দেশ এবং ভাষার জন্য গভীর মমতায়।

প্রথম আলো
১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

BanglaBook.org

তুমি সর্প হইয়া দংশন করো ওঝা হইয়া ঝাড়ো...

কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে, প্রেরকের নাম 'হুমায়ুন আজাদ'। নামটা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি, 'হুমায়ুন' আর 'আজাদ' দুটিই নাম হিসেবে বেশ প্রচলিত। তবে একসঙ্গে 'হুমায়ুন আজাদ' নামটি আমি প্রয়াত অধ্যাপক, কবি, লেখক, গবেষক হুমায়ুন আজাদের ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। চিঠিটা খুলে দেখি ভেতরে জেএমবির বিশাল দুটি লিফলেট। একটি বাংলায়, অন্যটি আরবিতে। (এই জোট সরকার আসার পর বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিদের অনেক জায়গাতেই আরবি পড়তে হচ্ছে, এয়ারপোর্টের নাম আরবিতে লেখা হয়েছে, লেখাপড়া সংক্রান্ত সরকারি বিলবোর্ডে বাংলার আগে আরবি স্থান পেয়েছে। জেএমবি তাদের লিফলেটও বিতরণ করছে আরবিতে!) যাই হোক জেএমবি কেন তাদের লিফলেটটি আমার কাছে পাঠিয়েছে আমার জানা নেই। আমি তাদের বক্তব্য পড়ে প্রভাবিত হব নাকি তারা আমকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রেরকের নামের জায়গায় 'হুমায়ুন আজাদ' লিখে দেওয়াটা নিঃন্দেহে বাংলা ভাই টাইপের একটা নিষ্ঠুর কৌতুক। যে মানুষটিকে হত্যা করার জন্য তারা পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছিল, প্রেরক হিসেবে তার নাম ব্যবহার করার মধ্যে তারা নিশ্চয়ই এক ধরনের তামাশা খুঁজে পেয়েছিল!

আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম। এখন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, 'শায়খ' আবদুর রহমান আমাদের হুমায়ুন আজাদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইউনুসকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ইউনুসের পর প্রফেসর তাহেরকেও হত্যা করা হয়েছে। এই দুজনের বেলাতেই হত্যাকারী হিসেবে জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম এসেছে। যখন থেকে এই দেশে ধর্মান্ধ জঙ্গি কথাটি শোনা যেতে শুরু করেছে তখন থেকেই তাদের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর নাম শোনা

BanglaBook.org

যেতে শুরু করেছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ঠিক কখন একজনের জামায়াতে ইসলামীর পরিচয় শেষ হয়ে জেএমবি পরিচয় শুরু হয় সেটা ধরতে পারি না। একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধী কুখ্যাত বদর বাহিনীর কমাণ্ডার বর্তমান জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীদের অবশ্য কখনো কোনো সমস্যা হয় না। জঙ্গিরা পুলিশ-র‍্যাবের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত ঠিক আছে, ধরা পড়ামাত্রই তারা তাদের থেকে একশ' হাত দূরে সরে যান। আমার কাছে জেএমবি যে লিফলেট পাঠিয়েছে সেটা পড়ে দেখেছি সেখানে তাদের যে উদ্দেশ্যের কথা লেখা রয়েছে তার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্যের কোনো পার্থক্য নেই- দুই দলই এই দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়। জামায়াতে ইসলামী এই মুহূর্তে বিএনপির ঘাড়ে বসে নির্বাচন করছে, এর মাঝে জেএমবি যদি বোমা মেরে মানুষ খুন করে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করে ফেলে জামায়াতে ইসলামীর তো কোনো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। ঐতিহাসিকভাবে বিবেচনা করলে পদ্ধতিটি নিয়েও তো তাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। জেএমবি এ কয়দিনে যত মানুষ খুন করেছে, একাত্তর সালে জামায়াতে ইসলামী তাদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এই দেশে তার থেকে অনেক বেশি মানুষ খুন করেছে। দলের সঙ্গে ইসলাম কথাটা জুড়ে দিলেই সেটা ইসলামের আদর্শকে বহন করবে, সে কথাটা কে বলেছে?

২

আমরা এখন একটা খুব বিচিত্র সময়ে বাস করছি। যখন এই দেশে মৌলবাদী জঙ্গি বাহিনী গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন পুলিশ বাহিনী তাদের সাহায্য করেছে। (কোহিনুর মিয়া মাসুদ মিয়া নামক নানা ধরনের মিয়া সাহেবদের নাম আমরা তখন জানতে পেরেছি।) যখন জঙ্গিরা বোমা মেরে নিরীহ মানুষ খুন করা শুরু করেছে তখন পুলিশ বাহিনী দেশের অধ্যাপক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে তাদের পীড়ন করা শুরু করেছে। সংবাদপত্র যখন বিষয়গুলো নিয়ে লেখালেখি করেছে তখন তাদের ধমক-ধামক দেওয়া হয়েছে! তখন জঙ্গিপ্রেমিক পুলিশ বাহিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাংসদ এবং মন্ত্রীরা- তারা চুনোপুঁটি মন্ত্রী নন, রীতিমতো হাওয়া ভবনের আশীর্বাদ পাওয়া মন্ত্রী। এমনই তাদের ক্ষমতা যে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বাংলা ভাইদের রক্ষা করে যান। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে এই জঙ্গি বাহিনী এখন

BanglaBook.org

ফ্রাংকেনস্টাইনে রূপ নিয়েছে। (নিজের হাতে দানব তৈরি করে যখন কেউ সেই দানবের হাতে মারা পড়ে তখন তাকে বলে ফ্রাংকেনস্টাইন। মূল কাহিনীতে যে দানবটি তৈরি করেছিল তার নাম ছিল ফ্রাংকেনস্টাইন, কিন্তু কীভাবে কীভাবে জানি সবাই দানবটাকেই ফ্রাংকেনস্টাইন বলে ডাকতে শুরু করেছে! ভুল নামকরণ এমন কিছু অবাক ব্যাপার নয়, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করাকেও আমরা বলি ক্রসফায়ার!)

দেশে জঙ্গি বাহিনী বলে কিছু নেই– সরকার দীর্ঘদিন থেকে এই কথা বলে আসছে। আমরা জানি, সরকার অনেক মিথ্যা কথা বলে, এটাও ছিল একটা ডাহা মিথ্যা কথা। তারা খুব ভালো করে জানত দেশে জঙ্গি বাহিনী রয়েছে, পত্রপত্রিকায় নিয়মিত আসছে, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট রয়েছে, মন্ত্রীরা দহরম-মহরম করছেন, কাজেই এত বড় একটা বিষয় না জানার কোনো উপায় নেই। তবে সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে জঙ্গি বাহিনীর কাজকর্ম মিলে গিয়েছিল তাই সরকার তাদের ঘাঁটায়নি। জেএমবি অকৃতজ্ঞ নয়, তাদের জন্য জোট সরকারের সমবেদনার সম্মানটুকু তারা রক্ষা করেছে। সার্ক সম্মেলনের সময় যখন ঢাকা শহর ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশ অরক্ষিত, বোমা ফাটালে যখন সারা পৃথিবীতে তার খবর পৌঁছানো যেতো, তখন তারা বোমা ফাটায়নি। অনেক হিসাব করে তারা বোমা ফাটিয়েছে সার্ক সম্মেলন শেষ হওয়ার পর। জঙ্গি বাহিনী তো জামায়াতে ইসলামী বা বিএনপির কাউকে কখনো খুন করেনি। তারা বামপন্থী মানুষ, শিক্ষক, সাংস্কৃতিকর্মী, বিচারক, প্রগতিশীল মানুষদের খুন করেছে। তারা সিনেমা হল, যাত্রা, সার্কাসে বোমা মেরেছে, মাজার আর ওরসে বোমা মেরেছে। কোনো ধরনের মানুষ এ রকম করে সেটা এই দেশের একজন দুধের শিশুও জানত, শুধু সরকার জানত না সেটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি বিশ্বাস করি না। আসল কথা হচ্ছে জঙ্গি যাদের শত্রু বিবেচনা করছে, এই সরকারেরও তাদের জন্য কোনো প্রেম নেই! কাজেই বোমাবাজি-হত্যাকাণ্ডে তারা এতটুকু বিচলিত হয়নি।

জঙ্গি বাহিনী যখন সারা দেশে একসঙ্গে ৫০০ বোমা ফাটিয়ে দিল তখন সরকার খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গেল। এখন যদি জঙ্গি বাহিনীকে অস্বীকার করা হয় তাহলে দেশটা আনুষ্ঠানিকভাবে বেনানা রিপাবলিক হয়ে যায়। তারপরও এর জন্য যে বিরোধী দলকে দায়ী করার চেষ্টা করা হয়নি তা নয়, ছোটখাটো নেতা এবং পাতিনেতারা চায়ের দোকানে টেবিলে থাবা দিয়ে এ রকম কথা বললে সহ্য করা যায় কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিশাল জনসভায় যদি এ রকম কথা বলে বসেন

BanglaBook.org

তখন কেমন জানি লজ্জা করে– মনে হয় দেশের মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীরা সত্যিই দেশের সাধারণ মানুষদের এত বড় গাধা ভাবেন? শেষ পর্যন্ত সরকারকে স্বীকার করতে হলো যে, দেশে জঙ্গি বাহিনী আছে, তখন ধর-পাকড় করা শুরু হলো– আমার ধারণা, নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে। অন্যদের ধরামাত্রই ক্রসফায়ার– জঙ্গিদের বেলায় ভুলেও ক্রসফায়ার নেই– আমি ক্রসফায়ারের ঘোরতর বিরুদ্ধে। একজন মানুষ যত বড় অপরাধীই হোক বিনাবিচারে তাকে মারা যায় না। এই সত্যটি র‍্যাব বাহিনী শুধু জঙ্গি এবং জামায়াতে ইসলামীর বেলায় মনে রাখে, অন্যদের বেলায় ভুলে যায়। দেশের মানুষ যেহেতু জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চলে গেছে কাজেই আপাতত তাদের ধরে জেলে রাখা হচ্ছে। একেবারে হাওয়া ভবনের আশীর্বাদপুষ্ট মন্ত্রীদের হাতে তৈরি করা এই জঙ্গি বাহিনী, তাদের সারা জীবন জেলে থাকতে হবে কে বলেছে? একাত্তরে স্বাধীনতার পরপর এই দেশের মানুষ যদি মতিউর রহমান নিজামীদের হাতের কাছে পেত, তহলে তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলত। সেই সময়ে বেঁচে গিয়েছিল বলে এখন তারা মন্ত্রী– এই কথাটা নিশ্চয়ই র‍্যাবের কর্মকর্তারা জানেন। তাই জঙ্গি বাহিনীর একজন নেতা-কর্মীকে ক্রসফায়ারে মরতে হয় না, তাদের যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশের মানুষের খুব ভুলোমন। মতিউর রহমান নিজামীকে যদি মন্ত্রী হিসেবে সহ্য করতে পারে ভবিষ্যতে বাংলা ভাইকে সহ্য করবে না কে বলেছে? কাজেই র‍্যাব বাহিনী অন্য সবাইকে ক্রসফায়ারে মেরে শেষ করে ফেললেও জঙ্গি বাহিনীর সবাইকে বাঁচিয়ে রাখছে।

জোট সরকার শেষ পর্যন্ত কী করবে দেখার জন্য আমার খুব কৌতূহল। তবে দেশে একটা বড় ব্যাপার ঘটে গেছে– জঙ্গিদের বোমাবাজি, খুন-খারাবি এই দেশের মানুষ একেবারে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামের নাম দিয়ে এই দেশে অনেক কিছু করা হয়। অনেক নিরীহ মানুষকে ইসলামবিরোধী মুরতাদ বলে জীবনকে অতিষ্ঠ করে দেওয়া হয়, খুন করা হয়, দেশছাড়া করা হয়। এবার সেটা কাজ করেনি, জঙ্গি বাহিনী যতই ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করার কথা বলুক দেশের মানুষের তাদের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই। এক সময় যারা তাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে এখন তাদের গর্তে গিয়ে লুকানোর জায়গা নেই। জামায়াতে ইসলামী নিজেদের প্রাণপণে জঙ্গিদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু থলের বিড়াল বের হয়ে গেছে। জামায়াতে ইসলামী কী ধরনের সংগঠন যারা ১৯৭১ দেখেছে তারা জানে। যারা জানত না তারা এখন দেখার একটা সুযোগ পেয়েছে– মনে হয় এর দরকার ছিল।

BanglaBook.org

খবরের কাগজে দেখেছি, 'শায়খ' আবদুর রহমান যখন সিলেট শহরে লুকিয়েছিলেন তখন তার ছেলেকে নাম পাল্টিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। মাদ্রাসায় নয়, স্কুলে। সিলেট শহরে কিন্তু অনেক মাদ্রাসা। আত্মঘাতী বোমা বানানোর জন্য বেছে নেওয়া হয় মাদ্রাসার ছাত্রদের, কিন্তু নিজের ছেলেকে পড়ানো হয় স্কুলে। এটা শুধু 'শায়খ' আবদুর রহমানের বেলায় সত্যি নয়, সকল ধর্ম ব্যবসায়ীর জন্য সত্য। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এই দেশের সাংবাদিকরা একটা তালিকা প্রকাশ করবেন, যেখানে যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন তাদের কার ছেলে কোথায় পড়াশোনা করছে তার বিবরণ থাকবে। আমি লিখে দিতে পারি সেটা দেখালে সবার চোখ গোল আলুর মতো বড় বড় হয়ে উঠবে।

৪

আজকাল স্কুলে যখন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় তখন যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় ছোট শিশুদের কেউ না কেউ অবধারিতভাবে র‍্যাব সেজে আসে। এই দেশে র‍্যাব খুব জনপ্রিয়, জঙ্গি ধরার উত্তেজনায় দৃশ্যগুলো সরাসরি টেলিভিশনে দেখে তারা আরও জনপ্রিয় হয়ে গেছে। বেচারা পুলিশদের দেখে আমার এক ধরনের মায়া হয়, পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হয় হরতালের সময় পিকেটারদের লাঠিপেটা করছে। নায়কের ভূমিকায় র‍্যাব, ভিলেনের ভূমিকায় পুলিশ। এ দেশে খুব দ্রুত পুলিশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং অপদার্থ বাহিনী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। 'পুলিশ জঙ্গিদের ধরতে পারেনি, র‍্যাব পেরেছে।' এটা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, পৃথিবীর সকল দেশে পুলিশকেই দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব নিতে হয়। আমি লিখে দিতে পারি যদি ওপর থেকে রাজনৈতিক আদেশ দিয়ে পুলিশের হাত-পা বেঁধে না রাখা হতো তাহলে পুলিশ বাহিনী অনেক আগেই এই দায়িত্বগুলো নিতে পারত। যে মাসুদ মিয়াদের জন্য পুলিশের এত বড় অসম্মান তারা পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি নয়, তারা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। এই দেশের সরকারের কী পরিকল্পনা আমার জানা নেই, কিন্তু পুলিশ বাহিনী যদি দেশের মানুষের সম্মান আর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে না পারে আমরা

BanglaBook.org

তাহলে খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে যাব। এ বিষয়টি নিয়ে কি পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা ভাবনা-চিন্তা করছেন?

কিছু না পেতে পেতে আমরা আজকাল কিছু আশা করি না। ধরেই নিয়েছি ইলেকট্রিসিটি থাকবে না, তা হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে এলে আমরা খুব খুশি হয়ে উঠি! ঠিক সে রকম আমরা ধরেই নিয়েছিলাম জঙ্গি বাহিনীকে কেউ ধরবে না, তারা বোমা ফাটিয়ে মানুষ মারতে থাকবে। তাই হঠাৎ করে যখন দেখতে পেয়েছি আসলেই জঙ্গিদের ধরা শুরু হয়েছে, আমাদের তখন আনন্দের সীমা নেই। যে জিনিসটি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এটি আমাদের বাড়তি পাওয়া নয়, এটি আমাদের নায্য পাওনা। অনেক আগেই এটা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। পৃথিবীর অন্য সব দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেটা রুটিনমাফিক করে সেটা আমাদের দেশে করা হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে– এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আমাদের এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুব দরকার।

জঙ্গি বাহিনীর বড় বড় নেতাদের ধরে ফেলা হয়েছে, অন্যদের কথা জানি না, আমি নিজে এখন বিশ্বাস করি আমাদের দেশের পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা বাহিনীরা দেশের যেকোনো অপরাধীকে ধরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। আমরা তার আরো প্রমাণ চাই, যা এখন জানতে চাই কারা ২১ আগস্টে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাসহ নেতাদের হত্যা করতে চেয়েছিল। আমরা জানতে চাই কারা শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে গ্রেনেড দিয়ে হত্যা করেছিল। বিরোধী দল নিজেরা নিজেদের মেরে ফেলেছে এ ধরনের হাস্যকর কথা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শোনা যায়, কিন্তু সেগুলো কেউ শুনতে চায় না। সবাই সত্য কথাটি শুনতে চায়। সেই সত্য কথাটি কী?

BanglaBook.org

৫

জঙ্গিদের বড় বড় নেতাদের ধরে ফেলার পর হঠাৎ করে দেশের সব মানুষের পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে পড়তে শুরু করেছে। এই জঙ্গি বাহিনী কখন, কবে, কোথায়, কী নৃশংস অত্যাচার করেছে এবং কোন সাংসদ, কোন মন্ত্রী, কোন পুলিশ অফিসার জঙ্গিদের ধরা দূরে থাকুক তাদের সাহায্য করেছে, পত্রপত্রিকাকে গালমন্দ করেছে সেই খবরগুলো নতুন করে মনে পড়তে শুরু করেছে। দেশের মানুষজন এই গডফাদারদের বহিষ্কার করার জন্য হইচই শুরু করেছে।

আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না, জঙ্গি বাহিনীর লোকজন যখন বোমাবাজি করে মানুষজনকে খুন-খারাবি করে তখন তাদের ধরে জেলখানায় ঢোকানো হয়, বিচার করে জেল-ফাঁসি দেওয়া হয়। যারা এই জঙ্গিদের তৈরি করেছে, লালন করেছে, বড় করেছে তাদের শুধু নিজের পদ থেকে বহিষ্কার করার দাবি করেই সবাই সন্তুষ্ট কেন? ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা ফাটানোর পর অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে সেই অপরাধে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ছাড়া পেয়েছিলেন আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। তার কাছে রিমান্ডে নিয়ে পীড়ন করার সেই ভয়ঙ্কর কাহিনীগুলো শুনেছিলাম। মুনতাসীর মামুন (এবং অন্যরা) কোনোভাবেই এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তারপরও তাদের এভাবে পীড়ন করা হয়েছিল। অথচ যারা এই জঙ্গিদের সহযোগিতা করেছে বলে প্রমাণ আছে, তাদেরকে তাদের পদ থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েই আমরা সন্তুষ্ট কেন? তাদের গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করার দাবিটুকু কেন জানাচ্ছি না?

ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরকে গ্রেপ্তার করে যদি রিমান্ডে নেওয়া যায়, তাহলে একজন মন্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া যায়। পুলিশের এসপিকেও নেওয়া যায়। পৃথিবীর সভ্য দেশে সেটি রুটিনমাফিক করা হয়।

আমিও স্বপ্ন দেখি, বাংলাদেশ একটি সভ্য দেশ বলে আমি গর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব।

প্রথম আলো
২০ মার্চ, ২০০৬

BanglaBook.org

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

নববর্ষ এলে সবাই হিসাব করে দেখে গত বছরটা কেমন গিয়েছে, তারপর সামনের বছরের জন্য ভালো ভালো কিছু পরিকল্পনা করে। নববর্ষের সঙ্গেই মনে হয় ভালো কিছু বা সুন্দর কিছু নিয়ে স্বপ্ন দেখার একটা যোগসূত্র আছে। নববর্ষ যে রকম খানিকটা ব্যক্তিগত, পুরো দেশের জন্য সে রকম হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। অবধারিতভাবে আমরা স্বাধীনতা দিবস এলেই হিসাব করে দেখি স্বাধীনতার পর কত বছর গিয়েছে, সেই বছরগুলো কেমন কেটেছে, এখন কী অবস্থায় আছি, সামনের দিনগুলো কেমন যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশের হিসাব অবশ্যি কখনো মিলতে চায় না, তাই বেশির ভাগ সময়ই বেশির ভাগ মানুষ লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তবে মজার কথা হচ্ছে, দিনকাল যত খারাপই থাকুক স্বাধীনতা দিবস এলে আমরা আনন্দ করি, হইচই করি। আমার প্রিয় বিষয় ছিল সেনাবাহিনীর প্যারেড, ছোট বাচ্চাদের মতো উৎসাহ নিয়ে সেটা দেখতাম। তবে ইদানীং সেটা ছেড়ে দিয়েছি– এই দেশে এখন রাজাকাররা মন্ত্রী হয়েছে। সেনাবাহিনী প্যারেড করছে আর রাজাকার মন্ত্রীরা সুদৃশ্য সোফায় বসে সেটি দেখছে, সেটি খুব কুৎসিত দৃশ্য– আমার পক্ষে সেটি দেখা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের সব জায়গাতেই নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। গুরুগম্ভীর আলোচনায় না গিয়ে গান-বাজনার আলোচনা শুনতে চাইলে সেটারও অভাব নেই। আজকাল অনেক টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে, সঠিক সংখ্যা এখনো চট করে বলে দিতে পারি না। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সব চ্যানেলই বিশেষ অনুষ্ঠান করে। (বিটিভি ছাড়া– বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু প্রায় সমার্থক, তাই যখন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করার চেষ্টা করে সেটা আর যাই হোক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হয় না।) আমাদের স্বাধীনতা দিবস এসেছিল একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে, তাই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, সাংবাদিকেরা হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকেন। পত্রপত্রিকাগুলো শুরু

BanglaBook.org

কারো আরও আগে থেকে, একেবারে মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে স্বাধীনতার মাস পালন করা শুরু হয়। একাত্তর সালের এই মাসে কোনদিন কী ঘটেছিল সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা হয়। যারা সেই উত্তাল মাসটা দেখেছিল তারা ছাড়া আর কেউ সেটা সত্যিকার অর্থে অনুভব করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তারপরেও খবরের কাগজের লেখা পড়ে খানিকটা হলেও আসল ব্যাপারটা অনুমান করা যায়।

স্বাধীনতা দিবস নিয়ে প্রায় মাসব্যাপী এই উদ্যোগ আসলে একটু বাড়াবাড়ি কি না আমার জানা নেই। ভিন্ন দেশ বলতে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা জানি। সেই দেশের স্বাধীনতা দিবস জুলাই মাসের ৪ তারিখ। সেই দিন উপলক্ষে দোকানপাটে বিশাল মূল্য হ্রাস এবং সন্ধেবেলা যেখানে সম্ভব সেখানে আকাশে আতসবাজি ফুটানো ছাড়া আলাদাভাবে কিছু দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু মাসব্যাপী এই উদ্যোগ আয়োজন নেই সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

স্বাধীনতার মাস বলে আমরা শুধু যে মার্চ মাসে হইচই করি তা নয়। ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমরা ফেব্রুয়ারি মাসেও সেটা করি। ডিসেম্বর মাসে করি বিজয় দিবস নিয়ে– পুরো ডিসেম্বর মাসটি থাকে আমাদের বিজয়ের মাস! একটি দিনকে স্মরণ করার জন্য পুরো মাস হইচই করার জন্যই মনে হয় বাঙালি জাতিকে হজুগে জাতি বলে। যারা একটু সন্দেহপ্রবণ তারা হয়তো এ ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করে আমাদের জাতীয় কিছু সমস্যা খুঁজে বের করে ফেলবেন। আমি কিন্তু এর মাঝে কোনো সমস্যা দেখি না, আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের কীইবা আছে, দেশের জন্য, ভাষার জন্য গভীর মমতার সেই দিনগুলোর কথা যদি সবাইকে মনে করিয়ে না দিই, তাহলে কেমন করে হবে?

তবে সবাই যে এগুলো এভাবে উপভোগ করে তা নয়। খবরের কাগজে দেখেছি স্বাধীনতা দিবস নিয়ে আমাদের এই বাড়াবাড়ি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী খুব বিরক্ত। আমি অবশ্য তাতে মোটেও অবাক হই না– বাংলাদেশেকে আঁতুড় ঘরে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছিল এই মানুষগুলো। বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ধরাও পড়েছিলেন, নেহাত কপালগুণে বেঁচে গিয়েছিলেন। একাত্তর সালের সেই স্মৃতি আমাদের জন্য যত আনন্দের, তার জন্য ঠিক ততটাই জ্বালা-যন্ত্রণার।

Banglabook.org

২

কিছুদিন আগে ভয়েস অব আমেরিকার একটি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে, সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে, তার মাঝে আমি কথা বলছি সিলেট থেকে, অন্য দুজন লন্ডন এবং বস্টন থেকে। প্রশ্ন করছে সারা পৃথিবী থেকে। যে প্রশ্নগুলো এসেছিল আমি যে খুব গুছিয়ে যথাযথভাবে তার উত্তর দিতে পেরেছি তা নয়, কিন্তু তারপরেও সেটি ছিল চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা। আলোচনার বিষয় ছিল একাত্তরের উত্তাল মার্চ এবং এখনকার মার্চ। একজনের প্রশ্নটি ছিল খুব সুন্দর। তিনি বললেন, একাত্তর সালের মার্চ মাসটি ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল মাস। প্রথম দিনই ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিয়ে সারা বাংলাদেশকে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের মাঝে ঠেলে দিলেন। সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন, আলোচনার নামে ইয়াহিয়া খানের কালক্ষেপণ, স্বাধীন বাংলা পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের জন্ম, তেইশে মার্চ সারা দেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, পঁচিশে মার্চে অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের শুরু। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার, রাজারবাগ আর পিলখানায় সেই হত্যাযজ্ঞের প্রতিরোধ। ছাব্বিশে মার্চে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু। একটি মাত্র মাসের ভেতর কত কিছু ঘটেছে এবং এ দেশের মানুষেরা সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগময় মুহূর্তে তার নেতৃত্ব দিয়েছে। তাহলে এখন কেন আমরা সেই নেতৃত্ব দেখি না?

প্রশ্নটি আসলেই ভাবনা করার মতো। আমি মনে করি, আমাদের খুব প্রয়োজনের সময় আমরা বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের মতো নেতাদের পেয়েছিলাম। আমাদের খুব বড় সৌভাগ্য যে, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে তারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা না হলে কী হতো চিন্তা করতেই আমি শিউরে উঠি। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ইচ্ছে হলেই ইরাকের মতো দেশ দখল করে ফেলে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীন ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা তখন ৭ কোটি, তার প্রায় ১ কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে! মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র নেই, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই। পাকিস্তান থেকে দক্ষ সেনাবাহিনী এসে এ দেশের মানুষদের মারছে, শক্ত খুঁটি গেড়ে বসেছে।

BanglaBook.org

বাংলাদেশকে কোনো দেশ স্বীকৃতি দিচ্ছে না, সেই অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদ সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নৌবহর পাঠিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের দিকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পালিয়ে যেতে পারে বঙ্গোপসাগর দিয়ে, তাদের পালাতে দেওয়া যাবে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণে কত দ্রুত পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল সেটি প্রায় অবিশ্বাস্য। এতদিন পর আমরা যখন সেই দিনগুলোর কথা ভাবি তখন পুরো ইতিহাসটুকুই স্বপ্নের মতো মনে হয়। বার বার আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের রক্ষা করার জন্য, সঠিক নেতাদের জন্ম দেওয়ার জন্য।

কাজেই এখন যখন দেখি সঠিক নেতৃত্ব দূরে থাকুক, কাজ চালানোর মতো নেতৃত্বও নেই তখন দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে হয়। তারপরেও ধৈর্য ধরে থাকি যে দেশের প্রয়োজনে হয়তো আবার সেই নেতৃত্বের জন্ম হবে।

৩

আমাদের দেশের একটি প্রজন্ম কীভাবে কীভাবে জানি বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঠিকভাবে না জেনেই বড় হয়ে গেছে। তাতে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রজন্মের কী ক্ষতি হয়েছে জানি না কিন্তু দেশের খুব বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাদের দেশের জন্ম ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল যে কেউ যদি সেটা সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারে তাহলে দেশের জন্য তার ভেতরে একটা গভীর মমতার জন্ম হয়। যারা সেটা অনুভব করে না তাদের ভেতরে সেই মমতাটুকু নেই। আমি অনেকদিন থেকেই সেটা টের পাচ্ছিলাম বলে, যখনই সুযোগ পাই ছোট ছেলেমেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলার চেষ্টা করি। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে শোনে, তাদের ভেতরে নানা ধরনের কৌতূহল নানা রকম প্রশ্ন, নানা রকম ক্ষোভ।

ছোট বাচ্চাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে আমার অনেক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সেই রক্তঝরা সময়ের ইতিহাস এতই মর্মস্পর্শী যে আমি এখনো হতবাক হয়ে যাই। আমি একই সঙ্গে আরও একটি বিষয় আবিষ্কার করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের ভেতরেই একটা গভীর অভিমান। যে দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য তারা তাদের জীবনের

BanglaBook.org

শ্রেষ্ঠ সময়টুকু দিয়েছেন, সহযোদ্ধাদের অকাতরে প্রাণ দিতে দেখেছেন, সেই দেশে রাজাকাররা গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যায় এবং দেশের মানুষ সেটা সহ্য করে– তাদের অভিমান হতেই পারে। এই মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স হয়েছে, তারা জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, অনেকে মারা যেতে শুরু করেছেন। আজ থেকে ১০-২০ বছর পরে তাদের আর কেউ বেঁচে থাকবেন কি না সেটাও আমরা জানি না। আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের সবচেয়ে বড় ইতিহাসের একটা অধ্যায় এই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে যাবেন– হাজার মাথা খুঁড়লেও আমরা আর সেটা ফিরে পাব না। আমাদের হাতে আর অল্প কয়েকটি বছর; এই সময়টুকুর ভেতরে আমরা এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের সম্মান আর ভালোবাসা জানাতে পারি। আমার মনে হয়, এ কাজ আমাদের শুরু করা দরকার।

নানাভাবে এই কাজটুকু শুরু হয়েছে, আমি খুব আনন্দ নিয়ে আবিষ্কার করছি– বিভিন্ন পত্রপত্রিকা শিশু-কিশোরদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। তারা গল্প লিখছে, কবিতা লিখছে, ছবি আঁকছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবাসতে শিখছে, সম্মান দেখাতে শিখছে। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনো নামে আমাদের একটি ছোট উদ্যোগের অংশ হিসেবে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বয়সের ভারে তারা ক্লান্ত, জীবনসংগ্রামে পরিশ্রান্ত– সম্মান দেখানোর জন্য তাদের সবাইকে একটা করে লাল টি-শার্ট দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের একটা বিরতিতে আমরা হঠাৎ একটি বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করলাম। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে আসা শত শত ছেলেমেয়ে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাদের অটোগ্রাফ নিচ্ছে। নতুন প্রজন্ম এতদিন শুধু গায়ক, শিল্পী, খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ নিয়েছে। এখন হঠাৎ তারা অনুভব করেছে, যে মানুষগুলোর চোখে-মুখে বয়সের বলিরেখা, একসময় তারা ছিল ১৮-১৯ বছরের তরুণ– এই দেশটাকে তারা যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছেন। এদের অটোগ্রাফ খুব মূল্যবান, তারা খুব আগ্রহ নিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করছে।

আমরা অস্বীকার করব না, আমাদের অবহেলার কারণে মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় মহান বিষয়টি আমাদের নতুন প্রজন্ম অনুভব করতে শিখেনি। যখন তাদের সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তারা সাগ্রহে সেটা শুনতে এসেছে, সেটা জানতে এসেছে!

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি সব সময়েই আরও একটি বিষয় অনুভব করি। সেটি হচ্ছে মার্চ মাস এবং ডিসেম্বর মাস এলেই সবাই যেন একটু নড়েচড়ে বসেন, তখন

BanglaBook.org

তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে পড়ে। এই মুক্তিযোদ্ধারা আর বেশিদিন থাকবেন না, একটা সময় আসবে যখন শত চাইলেও তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। তাদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন, আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর দায়িত্ব তাদের খুঁজে বের করে তাদের সেই গৌরবের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস, দুঃখ-কষ্ট এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস ধরে রাখা। শুধু ডিসেম্বর এবং মার্চ মাস নয় সারা বছর নিয়মিতভাবে এই অনুষ্ঠান হতে পারে। এই দেশে এতগুলো টিভি চ্যানেল রয়েছে, তাদের কেউ কি এই দায়িত্ব নিতে পারেন না? পত্রপত্রিকাতে বিনোদনের কত কী রয়েছে, টেলিভিশন, শিক্ষা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান কী সেখানে নেই? সংবাদপত্রের একটা অংশ কি শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাসের জন্য আলাদা করে রাখা যায় না? নিয়মিতভাবে সেখানে তাদের গৌরব গাঁথাগুলো লেখা হতে পারে, সংগৃহীত হতে পারে, নতুন প্রজন্মকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আমাদের ইতিহাস খুব গৌরবের ইতিহাস, যতদিন নতুন করে গৌরবের ইতিহাসের জন্ম দিতে না পারছি ততদিন পুরোনো ইতিহাসটুকুই তো আমাদের ধরে রাখতে হবে।

প্রথম আলো
২৬ মার্চ, ২০০৬

BanglaBook.org

বৈশাখের প্রথম দিনে

পয়লা বৈশাখ নিয়ে আমার শৈশবের খুব মিষ্টি একটা স্মৃতি রয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই মিষ্টি– কেউ যেন মনে না করে এর সঙ্গে সর্বজনীন শ্বাশত বাঙালির উৎসব বা এ ধরনের গুরুতর কোনো বিষয়ের সম্পর্ক আছে। মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছি, পয়লা বৈশাখে মামা আমার হাত ধরে বের হয়েছেন। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে যাচ্ছি, সব দোকানেই হালখাতা হচ্ছে। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই আমাদের মিষ্টি খেতে দিচ্ছে, খেয়ে খেয়ে পেট প্রায় ঢোল হয়ে গেল! মনে হচ্ছিল আহা প্রতিদিন যদি পয়লা বৈশাখ হতো কী মজাই না হতো। তখন ছোট ছিলাম বলে গুরুত্বটা দিয়েছিলাম মিষ্টির আকার-আকৃতি এবং পরিমাণের দিকে– তার পরও লক্ষ্য করেছিলাম, যেখানে যাচ্ছি তাদের কেউ হিন্দু এবং কেউ মুসলমান! দুই ধর্মের মানুষই একই অনুষ্ঠান করছে এবং তার মধ্যে মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপার আছে, তাই সেই ছেলেবেলায়ই অনুষ্ঠানটি আমার খুব মনে ধরে গিয়েছিল!

যখন বড় হয়েছি তখন আবিষ্কার করেছি শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, বাঙালি পাহাড়ি আদিবাসী– সবার জন্যই এ অনুষ্ঠান এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠান আর একটিও নেই। এর নিজস্ব একটি শ্বাশত রূপ আগে থেকে ছিল, যত দিন যাচ্ছে তার সঙ্গে আরও নানা রংয়ের নানা ঢংয়ের উৎসব যোগ হচ্ছে। পয়লা বৈশাখে এখন আনন্দ শোভাযাত্রা হয়, মেলা হয়, গানের অনুষ্ঠান হয়। পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করে, টেলিভিশন চ্যানেল বিশেষ অনুষ্ঠান দেখায়, সাধারণ মানুষ সেজেগুজে পান্তা খাওয়া থেকে শুরু করে আরও নানা ধরনের ছেলেমানুষি আনন্দ করে। মোবাইল কোম্পানিগুলো এসএমএস বিতরণ করে চুটিয়ে টু পাইস কামাই করে। বুদ্ধিজীবীরা কারুকাজ করা পাঞ্জাবি পরে সভা-সমিতিতে গলা কাঁপিয়ে বাঙালির ঐতিহ্যের ওপর বক্তৃতা দেন। সব মিলিয়ে এটি আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এ দেশে এখন এই পয়লা বৈশাখের মতো আনন্দময় উৎসব খুব কম আছে।

বলাবাহুল্য বায়তুল মোকাররমের খতিব কিংবা জে.এম.বি. ধরনের মানুষ

BanglaBook.org

তারা মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। পয়লা বৈশাখের বিরুদ্ধে তাদের নানা ধরনের ফতোয়া আছে। সাধারণ মানুষ এসব ফতোয়াকে খুব গুরুত্ব দেয় না বলে তারা শুধু ফতোয়া দিয়েই বসে নেই। গানের অনুষ্ঠানে বোমা ফাটিয়ে মানুষ মেরেছে। সাম্প্রতিককালে আমরা অনেক বোমা ফাটতে দেখেছি, কিন্তু পয়লা বৈশাখে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে সেই বোমা ফাটানোর দৃশ্যটির কথা কেউ কখনো ভুলতে পারবে না। ধর্মের নাম দিয়ে মানুষ কত নৃশংস হতে পারে, আমরা সেটি দেখেছিলাম ১৯৭১-এ। এ প্রজন্মের মানুষেরও সেটি দেখার দুর্ভাগ্য হয়ে গেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এখন যারা ধর্মের নামে মানুষ খুন করছে, তারা কিন্তু সেই একাত্তরের বিশ্বাসঘাতকদেরই বংশধর! কখনো আদর্শের দিক থেকে, কখনো একেবারে আক্ষরিকভাবে।

২

মোটমুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এ দেশের মানুষ হাজার বছর ধরে যে উৎসবটি পালন করছে কিছু খতিবের ফতোয়া কিংবা কিছু ধর্মান্ধ জঙ্গি বোমাবাজিতে, সেটি বন্ধ হবে না। যত দিন যাবে আমরা এ অনুষ্ঠানটিকে আরও বিকশিত হতে দেখব। এ দেশের মানুষের একটা মজার চরিত্র রয়েছে– এমনিতে একটা বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না, কিন্তু কেউ যদি সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করে, তখন হঠাৎ করে সবাই কেমন করে জানি একত্র হয়ে তার বিরুদ্ধে লেগে যায়। কাজেই পয়লা বৈশাখ ছিল এবং পয়লা বৈশাখ থাকবে। কেউ সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করলে আরও বেশি করে থাকবে।

তবে প্রশ্ন হলো, এটা কি সবার জন্যে থাকবে? যত দিন যাচ্ছে আমরা ততই দেখতে পাচ্ছি, খুব হিসাব করে দেশের মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। এক ভাগের আলাদা করে কোনো নাম নেই, অন্য ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘু। দেশের বড় পণ্ডিতজনেরা সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারবেন। আমার কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু আমি তবুও খুব জোর দিয়ে বলতে পারব, এ দেশে এখন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাসী মানুষের খুব দুঃসময়। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি, শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে প্রতিভাবান একজন ছাত্র শিক্ষক হতে পারছেন না। জোট সরকার আসার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্ষরিক অর্থে শত শত শিক্ষক নেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মাত্র

BanglaBook.org

দুজন এবং এই দুজন তাদের সমসাময়িক অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি মেধাবী হওয়ার পরও তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না! যারা নিয়োগ দেন তাদের অনেকেই মেরুদণ্ডহীন, আবার অনেকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ না দেওয়া খুব সওয়াবের কাজ। নানা ধরনের চুরি-চামারি করে তারা যে গুনাহ্ করেন, সেগুলো কাটাকাটি করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এই সওয়াবের কাজগুলো করে যান। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো সত্য কথা– বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান, যেখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হওয়ার কথা, সেখানে এখন সাম্প্রদায়িকতার কুচকুচে কালো অন্ধকার।

চারপাশের এই কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা দেখে আমি অবশ্য খুব উদ্বেগ বোধ করি না, কারণ আমি জানি, এটা কোনোদিন জয়ী হতে পারবে না। আমরা এখন এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন সারা পথিবীটা ছোট হয়ে আসছে। দেশ, দেশের সীমানা, দেশের ভাষা– এ রকম বিভাজন আছে সেটি সত্য কথা, কিন্তু তার সবকিছু ছাপিয়ে পৃথিবীর মানুষ একত্র হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ আর একা একা থাকতে পারে না, সবাইকেই এখন অন্য অনেক দেশের মানুষকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। যত দিন যাবে ব্যাপারটা ততই বেশি হতে থাকবে। যে মানুষ তার চারপাশে কিছু মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, তাকে সাম্প্রদায়িকতার মতো একটা প্রাচীন এবং অচল ধারণার কথা বোঝানো যায়, কিন্তু যে মানুষ আধুনিক পৃথিবীকে দেখেছে, সে কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেবে না। কাজেই আমরা দেখব যতই দিন যাবে সাম্প্রদায়িকতার মতো অচল বিষয়গুলো ততই দূর হতে থাকবে। যে দেশের মানুষ যত তাড়াতাড়ি সাম্প্রদয়িকতার মতো বিষয়গুলো ছুড়ে দিতে পারবে, তারা তত তাড়াতাড়ি আধুনিক পৃথিবীর মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারবে।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মকে বিষয়টি জানানোর ব্যাপার আছে। আমার বাবা খুব ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন এবং খুব শৈশবেই আমাদের শিখিয়েছিলেন, সব ধর্মই সত্য, সব ধর্মের মানুষই সৃষ্টিকর্তার কাছে যেতে চায়, শুধু তাদের পদ্ধতিটি ভিন্ন। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে, আমি খুব শৈশবেই জানতে পেরেছি, ভিন্ন মানেই খারাপ নয়। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আর ভিন্ন ভিন্ন কালচার আছে, কিন্তু তাদের কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই। ভিন্ন ভিন্ন মানুষে রয়েছে বৈচিত্র্য আর পৃথিবীর সৌন্দর্যটাই হচ্ছে এই বৈচিত্র্যে।

BanglaBook.org

এ বিষয়টি আমি একেবারে হাতে-কলমে আবিষ্কার করেছিলাম আমার প্রবাসজীবনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি যে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতাম, সেখানে আমাদের গ্রুপে ছিল জার্মান, ফরাসি, কোরিয়ান, ভারতীয়, গ্রিক, চায়নিজ আমেরিকান এবং আমি বাংলাদেশী। আমরা সবাই মিলে যখন আড্ডা দিতাম (হ্যাঁ, বাংলাদেশী মানুষ ছাড়াও অন্যরাও আড্ডা দেয়) তখন একটিবারও মনে হতো না, আমরা একজন থেকে অন্যজন আলাদা! অথচ সবাই তার নিজের জীবনে তার নিজের কালচার, নিজের ভাষা এবং নিজের দেশের জন্য মমত্ববোধকে ধরে রেখেছে। অনেকেই বলেন এবং বিশ্বাস করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটি এত দ্রুত এত ওপরে উঠে যাওয়ার কারণটি হচ্ছে, সারা পৃথিবীর মানুষ সেখানে একত্র হয়েছে! এটি একটি দেশ নয়, এটি একটি ছোট পৃথিবী।

ভিন্ন ভিন্ন কালচারের মানুষ একসঙ্গে থাকার মাঝে এক ধরনের সতেজ আনন্দ রয়েছে। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমাদের বাংলাদেশের একটা বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যে, আমরা খুব এক ধরনের মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন কালচারের মানুষের এখানে খুবই অভাব। ভিন্ন ধর্মের এবং কিছু আদিবাসী মানুষ দেশের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা তাদের দেখাই পাই না। আমি প্রায় ১২ বছর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি, কিন্তু আমার কী দুর্ভাগ্য, আমি এখন পর্যন্ত একজন গারো, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, মুরং, খুমী, রাখাইন বা অন্য কোনো আদিবাসী ছাত্রছাত্রী পাইনি। (কিন্তু আমি ভিন্ন দেশ নেপালের ছাত্রছাত্রী পেয়েছি)! আমি সবসময়ই স্বপ্ন দেখি, আমার সামনে একটি বাঙালি ছেলের পাশে একটি সাঁওতাল মেয়ে কিংবা একটি চাকমা ছেলের পাশে একটি গারো মেয়ে বসে আছে। তারা একসঙ্গে ক্লাস করছে, ক্লাস শেষে দলবেঁধে হইহুল্লোড় করছে, হাসি-তামাশা করছে, ভিন্ন ভিন্ন কালচারের মানুষ পাশাপাশি থাকার আনন্দটুকু উপভোগ করছে।

BanglaBook.org

৩

গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য আমি এ দেশের অনেক জায়গায় গেছি। মঞ্চে বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে দেখে কিংবা তাদের সঙ্গে কথা বলে বলে আমার নিজের ভেতর একটা ছোট পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি এখন যখন কখনো কোথাও দাঁড়িয়ে সামনে ছোট বাচ্চাদের বদলে গুরুগম্ভীর বড় মানুষদের দেখি, তখন কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করতে থাকি! গণিত অলিম্পিয়াডের বিষয়টি যারা পরিচালনা করে– কিছু অত্যন্ত উৎসাহ তরুণ– তারা গণিতের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কাজকর্ম

করে। ছেলেমেয়েদের দেশকে ভালোবাসতে শেখায়, নিজের মাকে, নিজের বাবাকে ভালোবাসতে শেখায়। প্রতিটি ভাষাকে ভালোবাসতে শেখায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তারা বলে গর্ভধারিণী মাতা এবং প্রিয় জন্মভূমির পরই একজনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হচ্ছে তাদের বাংলা ভাষা। এ ভাষাটিকে লালন করা, ভাষাটির বিকাশ করা, সেবা করা তাদের সবার দায়িত্ব। আমি সব অনুষ্ঠানেই কথাগুলো শুনেছি এবং মাথা নেড়েছি।

এ বছর গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য একটি নতুন শহর নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে রাঙামাটি। আমি খুব শৈশবে রাঙামাটি ছিলাম, তখন শহরটাকে যে রকম ছবির মতো মনে হয়েছে এখনো সেটি সেরকম আছে। গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানে যখন আমাদের উপস্থাপক একসময় ছেলেমেয়েদের নিজের গর্ভধারিণী মাতা এবং জন্মভূমি দেশকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, আমি মাথা নেড়েছি। তারপর যখন প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার কথা বলেছেন, তখন হঠাৎ করে আমি চমকে উঠেছি, কারণ আমার সামনে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে আছে, তাদের দেশের ভাষা বাংলা ভাষা, কিন্তু তাদের অনেকেরই মাতৃভাষা তো বাংলা নয়, সেটি অন্য ভাষা। তারা তাদের নিজেদের ভাষা শুনে বড় হয়েছে, কিন্তু এখন স্কুল-কলেজে পড়তে হচ্ছে অন্য একটি ভাষা, সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা। আমার এখন মনে হচ্ছে, রাঙামাটির সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আমাদের বলা উচিত ছিল, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাদের বাংলা ভাষাটা ভালো করে শিখতে হবে, কিন্তু সবার আগে তাদের গভীর মমতা দিয়ে আপন মাতৃভাষাটিকেও বিকশিত করতে হবে, লালন করতে হবে। আমি যে রকম আমার ভাষাকে ভালোবাসি, তারাও নিশ্চয়ই তাদের ভাষাকে ভালোবাসে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খুব দুরবস্থা। এখন এর একটি মাত্র ভালো দিক রয়েছে- অবস্থা যখন খুব খারাপ হয়, তখন সবার টনক নড়ে। 'টনক' জিনিসটা কী আমি জানি না, কিন্তু আমার ধারণা সেটা নড়ার সময় হয়েছে। যদি সত্যি সত্যি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করা যেত, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সবাইকে তার মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে পারতাম। কবে সেটি পারব আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের সেটি নিয়ে স্বপ্ন তো দেখতে হবে- একটি সাঁওতাল ছেলে পড়বে তার নিজের ভাষায়, চাকমা মেয়ে পড়বে তার নিজের ভাষায়, সেটি কি খুব বেশি দাবি করা হলো?

BanglaBook.org

৪

আমাদের দেশের গণতন্ত্রটি কেমন চলছে, মোটামুটি সবাই সেটা জানি। অনেক সময় মনে হয়, সাংসদরা শুল্কমুক্ত গাড়ি এনে বিক্রি করে দিয়ে টাকা কামাই করবেন, তাদের সে সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই বুঝি এত হইচই করে দেশে নির্বাচন হয়! দেশ বেশি উন্নত হয়ে গেছে, কলকারখানা বেশি বলে বিদ্যুতের অভাব, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, কিন্তু সেটি সুলক্ষণ, কারণ এর অর্থ সবার ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে– এ ধরনের পাগলের প্রলাপ শোনা যায়, কিন্তু অন্যরা দূরে থাকুক, যিনি সেটা বলছেন তিনি নিজেও সেটা বিশ্বাস করেন না। পুরো দেশটা আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরনুখ হয়ে আছে, কানসাটে একটা জ্বালামুখ বের হয়েছে, আরও বের হবে না সে কথাটি কে বলতে পারে? গণতন্ত্র কেমন চলছে, সেটা নিয়ে সবার ভেতরেই এক ধরনের উদ্বেগ।

একটা দেশে গণতন্ত্র চলছে, সেটা বোঝার কিন্তু খুব সহজ উপায় রয়েছে। সে দেশের সংখ্যালঘুদের গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'তোমরা কেমন আছ?' সংখ্যালঘুরা যদি হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলে 'ভালো আছি' তাহলে বুঝতে হবে, দেশে চমৎকার এটি গণতন্ত্র কাজ করছে। যদি তারা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিষণ্ন মুখে মাথা নিচু করে, তাহলে বুঝতে হবে দেশে গণতন্ত্র নেই।

অমাদের এখন সময় হয়েছে নিজেদের প্রশ্ন করার। আমরা, দেশের মূল জনগোষ্ঠী কি দেশের সংখ্যালঘুদের তাদের প্রাপ্য সম্মান এবং অধিকার দিতে পেরেছি? এই ছোট জনগোষ্ঠীটাই যে আমাদের মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে এবং সেই বৈচিত্র্যটাই যে আমাদের সৌন্দর্য, সেটা কি আমরা জানি? সেই সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করার চোখ কি আমাদের আছে?

বৈশাখের প্রথম দিনে দেশের সবাই যখন নতুন একটি বছরকে আহ্বান জানাচ্ছে, তখন কি আমরা আমাদের দেশের সেই বৈচিত্র্যটুকু আরও শত গুণে বিকশিত করার প্রতিজ্ঞা কারতে পারি না?

BanglaBook.org

প্রথম আলো
১৪ এপ্রিল, ২০০৬

একজন বীরশ্রেষ্ঠর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীগুলো শুনতে পারে সেজন্য আমরা 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনো' নামে এক ধরনের আয়োজন শুরু করেছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে খুব আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনে, যার মনের ভেতর যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। একদিন আমাদের তারা আমাদের বলল, 'আপনারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে কথাগুলো বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, আমরাও তো সেগুলো জানি না। একদিন সেগুলো বলবেন?' বিষয়টা নতুন নয়, আমরা সবাই জানি, খুব হিসাব করে চিন্তাভাবনা করে নতুন প্রজন্মকে বড় করা হচ্ছে যেন তারা মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে না পারে। যেটুকু জানবে সেটা অনেক সময় ভুল এবং মিথ্যা, সেটা নিয়ে বিতর্ক হবে, চেঁচামেচি হবে এবং নতুন প্রজন্ম একসময় পুরো বিষয়টাতেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে তাই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে সেখানে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী মিলি রহমানও ছিলেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে একাত্তরের বীরত্ব আর আত্মত্যাগের গল্পগুলো শুনেছে। সবার শেষে বলেছেন মিলি রহমান, একাত্তরে দেশের জন্য কী গভীর ভালোবাসা নিয়ে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান নিজের স্ত্রী অবোধ শিশুদের রেখে নিজের প্রাণ দিলেন সেই কাহিনী শুনতে শুনতে সবার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছিল। এখন আমাদের চারপাশে অন্যায়, অবিচার, লোভ-লালসা, হতাশা– সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্যই বুঝি আমাদের মধ্যে আবার দেশের জন্য ভালোবাসা, মানুষের জন্য ভালোবাসার সেই দিনগুলো ফিরে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী মিলি রহমান তার বক্তব্যের শেষে বললেন তার স্বামীর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনার একটা প্রক্রিয়া শুরু

BanglaBook.org

হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর কবর দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি চান একজন বীরশ্রেষ্ঠকে যেন বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা দিয়ে এমন জায়গায় কবর দেওয়া হয় যেখানে সবাই যখন খুশি যেতে পারে, তাদের সম্মান আর ভালোবাসা জানাতে পারে।

দুই দিন পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার আছে এমন একটি জায়গায় কবর দেওয়ার দাবি জানিয়ে একটি র‍্যালির আয়োজন করল। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক যুগ থেকে আছি, কোনো দিন এত বড় র‍্যালি দেখিনি। সেই র‍্যালিটি এত লম্বা হয়ে গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় আটানো সম্ভব হয়নি। ঢাকা শহরে দশজন মানুষ একটা ব্যানার নিয়ে দাঁড়ালে মোটামুটি খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়ে যায়। সুদূর সিলেটে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ রকম একটা র‍্যালি করলেও দেশবাসী জানতে পারে না। তারপরও আমি মনে করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই র‍্যালিটি দুই কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক. আমাদের নতুন প্রজন্মের হৃদয়ের গভীরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার স্বপ্নের জন্য গভীর ভালোবাসা, তাকে শুধু স্পর্শ করতে হবে। দুই. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো না হলে তারা সেজন্য পথে নামতে প্রস্তুত।

যেসব ব্যক্তি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরটি দেশে আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাদের ব্যাপারটি জানা দরকার। এই দেশে এখনো সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা সাধারণ মানুষের। তাদের হৃদয়ের কথাটুকু শুনতে হয়, সেই কথার গুরুত্ব দিতে হয়। যারা সেটি ভুলতে বসেছিলেন, কানসাট সেটি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

২

বাংলাদেশ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনেক কিছু অর্জন করবে। বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হয়তো একদিন ওয়ার্ল্ড কাপ জয় করবে। হয়তো এই দেশের কোনো এক সাঁতারু অলিম্পিকে স্বর্ণ জয় করে আনবে। বাংলাদেশের কোনো একজন ঔপন্যাসিক কিংবা কোনো একজন বিজ্ঞানী হয়তো একদিন নোবেল পুরস্কার পাবেন। কিন্তু এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে

আনার গৌরব শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের। ভবিষ্যতে যত বড় অর্জনই করুক এই দেশের কোনো মানুষ আর কোনো দিন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবে না।

আমাদের দেশের সেই সব সন্তানদের আমরা যথাযথ সম্মান দিতে পারিনি। কিন্তু যত দিন বাংলাদেশের পতাকাটি আকাশে উড়বে সেই মুক্তিযোদ্ধারা জানবেন পতাকার মাঝখানের লাল সূর্যটির রং তারা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে রঙিন করে রেখে গেছেন। সেই গৌরব তাদের হাত থেকে কেউ কোনো দিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা যতটুকু আনুষ্ঠানিক সম্মান দিতে পেরেছি তার সবচেয়ে বড় সম্মানটি হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠর সম্মান। বাংলাদেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ এই সম্মান পেয়েছেন এবং কোনো দিন কোনো বীর আর এই সাতজনকে ছাপিয়ে যেতে পারবেন না। ভবিষ্যতে অন্য বীরত্বের অন্য অর্জন হবে কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ আর কখনো হবেন না। তাই এই সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের কাছে শুধু সাতজন শহীদ সৈনিক নন, তার চেয়ে অনেক বড়। তাদের যে সম্মান দেওয়া হয়েছে সেই সম্মানটুকু রক্ষা করার দায়িত্ব এই দেশের মানুষের।

আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠর একজন হচ্ছেন– ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। পাকিস্তান নামে যে দানব রাষ্ট্রটির সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল সেই রাষ্ট্রের মাটিতে তিনি-তিন যুগ ধরে শুয়ে আছেন। তিনি যে সেখানে শুধু অনাদরে আর অবহেলায় শুয়ে আছেন তা নয়, এই দেশের এই বীরশ্রেষ্ঠকে সেই দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে অসম্মানও করা হয়। যে মানুষটি বাংলাদেশে বীরত্বের সবচেয়ে বড় খেতাবটি পেয়েছেন তার অন্তিম শয়নের স্থানটুকুকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি অবহেলা ও অসম্মান করে গেছে এবং আমরা সেটি সহ্য করেছি এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে?

অনেক দেরি করে হলেও শেষ পর্যন্ত বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে– এই দেশের জন্য সেটি অনেক বড় ব্যাপার। পাকিস্তানের মাটিতে শায়িত এই মানুষটিকে এই দেশের সাধারণ মানুষ সম্মান দেখাতে পারেনি, তাকে যখন দেশে ফিরিয়ে আনা হবে তখনো যদি সাধারণ মানুষ তাকে সম্মান দেখাতে না পারে তাহলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

অথচ ঠিক এটাই ঘটতে চলেছে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে কাতর অনুরোধ, সংবাদ সম্মেলন এবং মানববন্ধন করার পরও এই দেশের

BanglaBook.org

সরকার কিছু কর্মকর্তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে কবর দেওয়া হবে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এমন এক জায়গায়, যেখানে সাধারণ মানুষ আর কোনো দিন যেতে পারবে না। এত দিন পাকিস্তানে লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন, এখন বাংলাদেশে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেন। এই দেশের সরকার এখন কেমন করে ভাবনা-চিন্তা করে সেটা বোঝা সহজ হয় যদি ধরে নিই তাদের ভাবনা-চিন্তা অনেকটা পাকিস্তানিদের মতো– সেটা যেন আবার নতুন করে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে।

বীরশ্রেষ্ঠর কবরটি সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই, লোকচক্ষুর আড়ালে ক্যান্টনমেন্টের গভীরে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পরপরই একজন সাংবাদিক আমাকে খবরটি জানিয়েছিলেন। সাংবাদিকের গলায় ক্ষোভ ছিল কারণ শুধু যে সবার দাবি উপেক্ষা করে গোয়ার্তুমি করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা নয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী মিলি রহমানকে নিয়ে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করে বসেছিলেন। মন্ত্রীদের মুখে নানা ধরনের 'ফালতু' কথা শুনে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তারপরও এগুলো কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। সাংবাদিকের কাছে আমি জানতে পারলাম যখন মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করা হলো বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে না? তখন তিনি বললেন যে, সেটি সত্য নয়। ক্যান্টনমেন্টে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।

BanglaBook.org

৩

আমি জানি সাধারণ মানুষ ক্যান্টনমেন্টে যেতে পারে না। মন্ত্রী মহোদয় আমার কথা বিশ্বাস না করলে একদিন একটা সিএনজি করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পৃথিবীর কোনো দেশেই সাধারণ মানুষ ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে পারে না– ঢোকার কথাও নয়। অন্য দেশের ক্যান্টনমেন্টকে শহর থেকে দূরে রাখা হয়, ঢাকায় সেটা একেবারে শহরের মাঝখানে। দরিদ্র দেশ, রাস্তাঘাট বেশি নেই তাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রাস্তাগুলো সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করতে হয়। যখন তারা সুযোগ পায় তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঝকঝকে তকতকে রাস্তাঘাট বাড়িঘর দেখে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দরিদ্র দেশের যেটুকু অর্থ আছে

তার বিশাল একটা অংশ ব্যবহার করা হয়েছে কিছু মানুষের জীবনকে আরামদায়ক করার জন্য এই হিসাবটি মেলানো খুব সহজ নয়। আমার পরিচিত একজন এয়ারপোর্ট রোডে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, জরুরি চিকিৎসার জন্য তাকে কম্বাইন্ড মিলিটারি সাহপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালটি তাকে চিকিৎসা না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিল। সামরিক হাসপাতালের সকল সুযোগ তাদের নিজেদের জন্য, বাইরের সাধারণ মানুষ সেই সুযোগ পেতে পারে না। আমি নিশ্চিত, সারা পৃথিবীতে এ রকম একটি হাসপাতালও নেই, যেটি একজন মরণাপন্ন রোগীকে জরুরি চিকিৎসা না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

সময় বাঁচানোর জন্য আমি আগে মাঝেমধ্যে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে শর্টকাট মারার চেষ্টা করতাম। আজকাল ভুলেও চেষ্টা করি না, গেটে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন তারা মানুষের প্রয়োজনীয় সম্মান দিয়ে কথাবার্তা বলতে উৎসাহ দেখান না। একবার হরতালের মধ্যে আমি হেঁটে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম, আমাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল! (কারণ হিসেবে বলেছিল, আমার চেহারা নাকি সন্দেহজনক!)

মতিউর রহমান যত দিন শুধু মতিউর রহমান ছিলেন তত দিন তার ওপর অধিকার ছিল তার স্ত্রী, তার সন্তানদের তার আপনজনদের। যখন তিন ফ্ল্যাইট লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন তখন এই দেশের সামরিক বাহিনীও তাকে নিজের মানুষ হিসেবে দাবি করতে পারে। যখন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হয়েছেন তখন সারা বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু তার ওপর অধিকার জন্মে গেছে। কাজেই দেশের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকে এমন একটি জায়গায় সমাহিত করতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ যখন খুশি যেতে পারে, যখন ইচ্ছে যেতে পারে। ক্যান্টনমেন্টে লোকচক্ষুর আড়ালে তাকে লুকিয়ে রাখা যাবে না- এটি এই দেশের মানুষের দাবি।

BanglaBook.org

৪

আমাদের আরও একজন বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমানের কবরটিও বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে তিনি শহীদ হয়েছিলেন তার কাছাকাছি তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেটি এখন ভারতের মধ্যে পড়েছে। আমি মনে করি, সিপাহি হামিদুর রহমানের কবরটিও আমাদের দেশের ভেতরে

।।য়ে আসা উচিত। যে দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন সেই দেশের মাটিতেই কী তার অন্তিম শয়ানটি হওয়া উচিত নয়?

আমাদের আরও একজন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের কবরটিও নাকি খুব বিপজ্জনক জায়গায়। বর্ষাকালে পানিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, মাটি ভেঙে একদিন যদি কবরটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তখন কী হবে? আমি মনে করি, হামিদুর রহমান এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফের কবর দুটি ঢাকা শহরের কোনো একটি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা উচিত।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজন বীরশ্রেষ্ঠর কবর যদি এই দেশের রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়, তাহলে কী সব বীরশ্রেষ্ঠের জন্য একটি চমৎকার বীরশ্রেষ্ঠ কমপ্লেক্স তৈরি করা যায় না? বড় একটা জায়গায় আমাদের দেশের স্থপতিরা তাদের সকল মমতা দিয়ে এই বীরশ্রেষ্ঠদের সমাধিমূল তৈরি করবেন। সেখানে তাদের ওপর একটা জাদুঘরের মতো গড়ে উঠবে, তাদের বীরত্বের কথা লেখা থাকবে। মানুষ যেভাবে আমাদের সংসদ ভবন দেখতে যায়, শহীদ মিনার দেখতে যায় কিংবা স্মৃতিসৌধ দেখতে যায় ঠিক সেভাবে এই বীরশ্রেষ্ঠ কমপ্লেক্স দেখতে আসবে। একাত্তর সালে দেশের জন্য কী গভীর মমতায় তারা প্রাণ দিয়েছিলেন এই দেশের নতুন প্রজন্ম সেটি আবার নতুন করে অনুভব করবে।

৫

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমার মনে হয় এখানে অন্য একটি বিষয়ের কথা বলা যায়। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আমাদের দেশটি যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে ঠিক তখন আমাদের পাশের দেশ ভারত বড় বড় লাফ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। একটি বড় দেশের পাশে একটি ছোট দেশ থাকলে দুই দেশের ভেতরে নানা সমস্যা হয়, কিছু কিছু সমস্যা বাস্তব কিছু সমস্যা কৃত্রিম, নানা রকম উদ্দেশ্যে সেগুলো তৈরি করা হয়, ব্যবহার করা হয়। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সেরকম এখন নানা রকম সমস্যা। ফারাক্কা সেরকম খুব বাস্তব সমস্যা। টিপাই মুখে বাঁধ নূতন একটি সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। এই দেশের কিছু অবিবেচক মানুষের কারণে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প ভারতের দখলে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে– খুঁজে খুঁজে আরও অনেক সমস্যা বের করা যায়। যারা

BanglaBook.org

রাজনীতি করেন তারা মূল সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানের চেষ্টা না করে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ভারতকে গালমন্দ করে সহজে বাহাবা কুড়িয়ে নিতে খুব পছন্দ করেন।

সবকিছুর পরও আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী এই দেশে যুদ্ধ করেছে, তাদের অনেক সৈন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমার খুব লজ্জা হয় যখন দেখি এই দেশের ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাণ বিসর্জনকারী সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা স্মৃতিসৌধ নেই। আমরা অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে চাই না, নাম না জানা যে ভারতীয় সৈনিকেরা এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের প্রতি সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই দেশে একটি মনুমেন্ট তৈরি করা উচিত। বাংলাদেশ একটি বিশাল বড় ব্যাপার, যাদের ত্যাগ এবং ভালোবাসায় এই দেশ জন্মলাভ করেছে তাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

আমার মনে হয়, শুধু তাহলেই আমাদের নিজেদের বীরদের প্রতি আমরা সত্যিকারভাবে সম্মান জানাতে পারব। যারা অকৃতজ্ঞ তাদের সম্মানকে কি কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেবে?

প্রথম আলো
৪ মে, ২০০৬

BanglaBook.org

আমরা যারা শিক্ষক

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে চোখ বোলানোর সময় আমি মনে মনে ভাবি, আজ নিশ্চয়ই দেখব, সরকার আমাদের শিক্ষকদের সব দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে। সব শিক্ষক প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করতে করতে হাসিমুখে কাজে ফিরে গিয়েছেন আর ছেলেমেয়েদের হইচই, দুষ্টমি, চেঁচামেচিতে স্কুলঘরগুলো মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু খবরের কাগজে সেই খবর ছাপা হয় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খবর পেলাম এক ধরনের আশ্বাস পেয়ে শিক্ষকেরা শহীদ মিনার ও মুক্তাঙ্গন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিশ্বকাপের বড় বড় উজ্জ্বল ছবি, বড়-বড় ব্যানার-হেডিংয়ে বিভিন্ন দলের ফাইনাল, কোয়াটার ফাইনালে ওঠার উত্তেজনা, ফুটবল নিয়ে দেশি-বিদেশি কলামের পর যেটুকু জায়গা থাকে সেটুকু ইলেকশন কমিশনারের গোয়ার্তুমি আর দুই রাষ্ট্রপতির রহস্যের খবরে জমজমাট হয়ে থাকে। কোথাকার কোন শিক্ষকরা, তাদের আন্দোলন, অনশন, প্রতিবাদের খবর ছাপানোর জায়গা কোথায়? খুঁজে খুঁজে শিক্ষকদের খবর বের করতে হয়– তাদের ব্যাপারে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের তারকা খেলোয়াড়দের বুটের নিচে আমাদের দেশের শিক্ষকদের সব খবর চাপা পড়ে গেছে।

অথচ এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না। বাংলাদেশ বা যেকোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হওয়ার কথা ছিল সেই দেশের শিক্ষকদের। কিন্তু শিক্ষক নামের এই মানুষগুলো কেন এই দেশে কোনো গুরুত্ব পান না?

এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। বিশেষ কোনো লেখাপড়া না করেই এই দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। তাদের পুত্র, পৌষ্য পুত্ররা যারা ভবিষ্যতে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন, তারাও স্কুল-কলেজে খুব একটা পড়ালেখা করেছেন সেরকম প্রমাণ নেই। তাদের যত টাকা তার থেকে বেশি ক্ষমতা। ব্যবসা-বাণিজ্য আকাশ-মাটি টেলিভিশন চ্যানেল কী তাদের নেই?

BanglaBook.org

একজন মানুষকে যখন খুশি জেলে ঢুকিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলা তো তাদের কাছে ডালভাত, তারা ইচ্ছে করলে দেশের রাষ্ট্রপতিকে মোটামুটি গলাধাক্কা দিয়ে বঙ্গভবন থেকে বের করে দিতে পারেন। যারা কোনো রকম লেখাপড়া ছাড়া এই দেশে এত অর্থ এবং এত ক্ষমতা ভোগ করেন, তারা কেমন করে লেখাপড়ার গুরুত্বটুকু বুঝবেন? আমার ধারণা, তাদের লেখাপড়ার প্রতি এক ধরনের হেলাফেলার ভাব আছে। আর যারা এই হেলাফেলার বিষয়টুকুর জন্য জীবনপাত করেন, সেই শিক্ষকদের প্রতি যদি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে, তাহলে তাদের কী দোষ দেওয়া যায়?

আমার ধারণা, এখানে আরও একটা ব্যাপার আছে। আমি অর্থনীতি ভালো বুঝি না, তার পরও আমার মনে হয়, এই দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিন ধরনের মানুষ। এক. প্রবাসী শ্রমিক– যারা আপনজনকে এই দেশে ফেলে রেখে কোনো দূরদেশে নিজের শ্রমকে বিক্রি করেন। তাদের শরীরের ঘাম আর নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘনিশ্বাসের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কোষাগারে ডলার আর পাউন্ড জমা হয়। দুই. গার্মেন্টস শ্রমিক, কমবয়সী মেয়েরা– যাদের স্কুলে পড়ালেখা করে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পেয়ে অন্যদের পাশে হাসিমুখে পত্রিকায় ছবি তোলার কথা, কিন্তু যারা দুঃসহ পরিবেশে কাপড় সেলাই করে মালিকদের পকেট ভারী করছে। তিন. কৃষক– যারা এই ছোট দেশটিতে ফসলের পর ফসল ফলিয়ে ১৪ কোটি মানুষকে দুবেলা ভাত খাওয়াচ্ছে! তারা গ্রামে থাকেন, তাদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করে, যৌতুকের অভাবে তাদের মেয়েদের বিয়ে হয় না। তাদের উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগ নিয়ে যায় মহাজন আর দালালেরা।

প্রবাসী শ্রমিক, গার্মেন্টস কর্মী আর কৃষক– দেশের এই তিন ধরনের মানুষের কেউই কিন্তু লেখাপড়া জানা মানুষ নয়। এই দেশের যে লোভী মানুষগুলো এই তিন ধরনের মানুষকে ব্যবহার করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে, তারা এই পদ্ধতিটাতেই খুব সন্তুষ্ট। মানুষগুলো লেখাপড়া না শিখলেই তাদের সুবিধে, শিখলেই বরং যন্ত্রণা! আমার ধারণা, তারা খুব চিন্তাভাবনা করে লেখাপড়ার বিষয়টাকে বিত্তশালীদের একটা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তাদের হাতে ব্যাংক-বীমা শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য। তাদের মতো বিত্তশালীদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মিডিয়াম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে এই ব্যাংক-বীমা-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই তারা খুশি, দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন

BanglaBook.org

মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। যেহেতু লেখাপড়া নিয়েই তাদের মাথাব্যথা নেই, তাহলে সেই লেখাপড়া যারা করান, সেই শিক্ষকদের নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কেন থাকবে?

২

বছর দুয়েক আগে একবার খুব বন্যা হওয়ার পর আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার দশেক প্রাইমারি ছাত্রছাত্রীদের খাতা, কলম, পেনসিল, টি-শার্ট এ রকম কিছু ত্রাণসামগ্রী দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমাদের ঠিকানা লেখা একটা খাম দেওয়া হয়েছিল, সব বাচ্চাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, বছর শেষে আমাদের চিঠি লিখে জানাতে যে তারা কেমন করছে। ১০ হাজারের ভেতর প্রায় ৩-৪ হাজার চিঠির উত্তর এসেছিল। আমি চিঠির বিষয়বস্তু জানার জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম। প্রত্যন্ত একটি গ্রামের স্কুলের একটা ছেলে কিংবা মেয়ে কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করে– আমার জানার খুব কৌতূহল ছিল।

খামগুলো খুলে চিঠিগুলো পড়ে আমার অসম্ভব মন খারাপ হয়েছিল। কারণ কোনো বাচ্চা নিজে চিঠির উত্তর লিখেনি। সবার চিঠি হুবহু এক– নিশ্চয়ই তাদের শিক্ষক বোর্ডে উত্তরটা লিখে দিয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা সেটা কাগজে টুকেছে। তাদের নিজেদের লেখার ক্ষমতা নেই, তারা আসলে কোনো লেখাপড়া শেখেনি। একটি বাচ্চা নিজে নিজে উত্তর লেখার চেষ্টা করেছিল, সে লিখেছে 'গনজি=বালা/ফিনসিল=বালা/কলম=বালা/খাতা=বালা/লবাট=বালা'। আমি তার মর্মোদ্ধার করেছি এভাবে 'গেঞ্জিটা ভালো, পেনসিলগুলো ভালো, কলমগুলো ভালো, খাতাগুলো ভালো এবং রবারটাও (ইরেজার) ভালো।'

পড়ালেখার মান নিয়ে যেসব গবেষণা হয়, আমরা মাঝেমধ্যে তার ভেতরে দেখেছি যে প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখার মান খুব খারাপ, কোনো রকম গবেষণা ছাড়াই সে চিঠিগুলো থেকে আমি সেটা আবিষ্কার করেছি। আমরা কি সেজন্য শিক্ষকদের দায়ী করব?

কেউ যদি সুরম্য অট্টালিকায় এয়ার কন্ডিশন একটি ঘরে বসে অনেক কাগজপত্র ঘেঁটে এই গবেষণা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষকদের দায়ী করবেন। কিন্তু কেউ যদি নৌকা করে নদী-বিল পার হয়ে প্রত্যন্ত কোনো একটা গ্রামে গিয়ে প্রাইমারি স্কুলের অবস্থা দেখে আসেন, তাহলে তিনি ভুলেও এজন্য

BanglaBook.org

শিক্ষকদের দায়ী করবেন না। ঘরবাড়ি নেই, চেয়ার-টেবিল নেই, বাচ্চাদের খাতা-কলম নেই, রাতে পড়ার জন্য কুপিতে কেরোসিন তেল নেই, গায়ে কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, স্কুলের শিক্ষক নেই– এ রকম স্কুলে একটি ছেলে বা মেয়ে কেমন করে পড়াশোনা করবে? একজন শিক্ষকের হাতে কয়েকটা ক্লাসের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব, তিনি কেমন করে পড়াবেন? সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে, এই শিক্ষকদের ছাত্র পড়ানোর সময় পর্যন্ত নেই। ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে, টিকা দেওয়া বা স্যানিটারি পায়খানা গোনার কাজগুলোও তাদের করতে হয় সব কাজ ফেলে রেখে। এতসব পরিশ্রম করার পর তাদের বেতন কত? এই দেশের সাধারণ মানুষ কী সেটা জানতে আগ্রহী?

একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের বেতন আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকার ভেতরে, তার সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ি ভাড়া। বর্তমান বাংলাদেশে এইটুকু বেতন দিয়ে কে সংসার চালাতে পারে? যদি প্রাইমারি স্কুলটি বেসরকারি হয়, তাহলে বেতন পান শতকরা নব্বই ভাগ– বাড়ি ভাড়াটুকু নেই। এই শিক্ষকেরা তাদের সন্তানদের মুখে কি কোনোদিন ভালো কিছু তুলে দিয়েছেন? ঈদে কিংবা পূজায় নতুন জামা কিনে দিয়েছেন? রোগে-শোকে চিকিৎসা করিয়েছেন? সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকদের। তাদের বেতন ৭৫০ টাকা। না, আমি ভুল লিখিনি, আসলেই ৭৫০ টাকা। রান্নাঘরে বাসন ধোয়ার জন্য কাজের বুয়াকে অনেক সময় এর চেয়ে বেশি বেতন দেওয়া হয়, অথচ আমাদের সন্তানদের যারা পড়াচ্ছেন তাদের হাতে মাত্র ৭৫০ টাকা তুলে দিচ্ছি? একজন শিক্ষকের জন্য এর চেয়ে বড় অসম্মান কী হতে পারে?

শিক্ষকেরা তাদের ভেতরের বৈষম্যটুকু ভুলে দিয়ে একটি সম্মানজনক বেতনের জন্য আন্দোলন করছেন। এই দেশে এর থেকে যৌক্তিক আন্দোলন কি আগে কখনো হয়েছে?

BanglaBook.org

৩

একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষকেরা সমাজের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত মানুষ ছিলেন। গল্প-উপন্যাস-নাটকে শিক্ষকেরা ছিলেন আদর্শ এবং ত্যাগী মানুষ। তারা নেতৃত্ব দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিতেন। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, যদিও সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন অনেক খাঁটি শিক্ষাবিদ রয়েছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষক বললেই এখন আমাদের চোখে লাল-নীল দলের একজন ধুরন্ধর মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে– যিনি ছাত্রছাত্রী পড়ান না, দলবাজি করেন প্রভোস্ট-প্রক্টর হওয়ার জন্য। কলেজের শিক্ষকের বেলাতেও একই অবস্থা, সেখানে যত ভালো শিক্ষকই থাকুক না কেন, কলেজশিক্ষক বললে চোখের সামনে ঘরের ভেতরে কোচিং সেন্টার খুলে বসে থাকা একজন বিদ্যা-বিক্রেতার ছবি ভেসে ওঠে। স্কুলের শিক্ষকের বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের যত স্নেহই করুন না কেন, খবরের কাগজে ছাপা হয় নিষ্ঠুর শিক্ষকদের খবর। তারা অর্থকষ্টে জর্জরিত, তাদের বেতন বাসার কাজের বুয়া থেকেও কম তাই তারা জোর করে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ান।

এই হলো সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষকের পরিচয়। তাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার খবরটুকু কেউ জানে না, শুধু তাদের পরিশ্রম আর ত্যাগের খবরটুকু কেউ জানে না, জানে শুধু তাদের নেতিবাচক অংশটুকু। দেশের মানুষ যদি ধরে নেন, পড়ালেখা না-জানা প্রবাসী শ্রমিক, গার্মেন্টস কর্মী আর কৃষকদের দিয়েই এই দেশ এগিয়ে যাবে, আমাদের কখনোই জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, তাহলে আমাদের শিক্ষকদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যদি স্বপ্ন দেখি এই দেশ একদিন জ্ঞানে, বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাহলে সবার আগে আমাদের শিক্ষকদের দিকে তাকাতে হবে। কেউ জানুক আর না জানুক, কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, এই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হচ্ছেন এই শিক্ষকেরা। যতদিন দেশের মানুষ এই শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান না দিচ্ছেন, তাদের খেয়ে-পরে সংসার চালানোর সুযোগ করে না দিচ্ছেন, ততদিন এই দেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে শিক্ষকদের কম বেতন। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর আমরা জানি, একজন শিক্ষকের বেতন কত হওয়া দরকার। (আমি যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তাহলে এখন সারা বছরে যত বেতন পাই, তখন এক মাসে সেই বেতন পেয়ে যাব।) এই দেশের মানুষকেই ঠিক করতে হবে, তারা তাদের সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে চান কি না। যদি দিতে চান, তাহলে সবার আগে শিক্ষকদের সম্মান দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। একজন মানুষকে অভুক্ত রেখে তাকে সম্মান জানানো যায় না। এই দেশের মানুষেরা জানে কি না আমি জানি না, আমাদের অনেক শিক্ষক কিন্তু প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই আছেন।

BanglaBook.org

একেবারে বাধ্য হয়ে শিক্ষকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। শ্রমিকেরা আন্দোলন করতে নেমে কল-কারখানা জ্বালিয়ে দিতে পারেন খুব দ্রুত তখন সরকারের টনক নড়ে। ছাত্ররা রাস্তাঘাট বন্ধ করে গাড়ি ভাঙচুর করতে পারে, রাজনৈতিক একটা ঝামেলা হয়, সমাধানের জন্য সরকার ছুটে আসে। শিক্ষকরা আন্দোলন করতে গিয়ে বড়জোর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারেন, তারপর আর কিছু করতে পারেন না। তাই তারা অনশন করছেন। যে শিক্ষকেরা এমনিতেই আধপেটা খেয়ে থাকেন, তারা আরও দু-চার দিন না খেয়ে থাকলে কী এমন ক্ষতি হবে– সরকারের তাই কোনো মাথাব্যথা নেই। আর্জেন্টিনা কয় গোল দিল আর ব্রাজিল কয় গোল দেবে, এ ধরনের গুরুতর বিষয় নিয়ে সারা দেশ এখন উত্তেজিত। তাই কোথাকার কোন শিক্ষকরা বেতন নিয়ে আন্দোলনের দিকে যাচ্ছেন, সেদিকে কারও নজর নেই। এই দুঃখ আমরা কোথায় রাখি?

এই দেশের শিক্ষকদের নয়, দেশের মানুষের ঠিক করতে হবে, তারা কী চান। তারা যদি চান যে তাদের সন্তানেরা সুশিক্ষিত হবে, শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নয় দেশের ভবিষ্যৎটুকুও গড়ে তুলবে, তাহলে এই দেশের শিক্ষকদের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে এই দেশের সাধারণ মানুষের মুখ থেকে এই দাবিটি উঠে আসেনি, এই দাবিটি উঠে এসেছে শিক্ষকদের নিজেদের মুখ থেকে। শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা হলে সব সময় তার সাফল্যটুকু পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করার প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন। পৃথিবীর যেসব দেশ দেখতে দেখতে উন্নত হয়ে উঠেছে, খোঁজ নিলে দেখা যায়, তারা সবাই শিক্ষার পেছনে অর্থ ঢেলেছে। তাদের দেশে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল রয়েছে। সেই বেতন স্কেল এত চমৎকার যে দেশের সবচেয়ে মেধাবী মানুষ, সৃজনশীল মানুষ শিক্ষকতার পেশার জন্য ছুটে আসে। ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়, দেশ লাভবান হয়, সারা পৃথিবী তার সুফল পায়।

সরকারের কাছে আমার কাতর অনুরোধ, সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ এই দেশের শিক্ষকদের আর অসম্মান করবেন না। তাদের অত্যন্ত যৌক্তিক দাবিটুকু মেনে নিন। আমরা জানি, তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার থেকে অনেক বেশি অর্থ এই দেশে রুটিনমাফিক অপচয় করা হয়। 'একমুখী শিক্ষার' জন্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে, সত্য-মিথ্যা জানি না, খবরের

BanglaBook.org

কাগজে কানাঘুষা হচ্ছে, মালয়েশিয়ায় হাজার হাজার কোটি টাকা আটকা পড়ে আছে। বাজেটে প্রতিরক্ষার খরচটুকু নিয়ে সবার মনে খটকা, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে একবার হেঁটে এলে মনে হয়, ভিন্ন দেশে চলে এসেছি, একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সেখান থেকে টাকা বের করে আনা যায়। প্রয়োজন একটু সদিচ্ছার। এই দেশে এইটুকু সদিচ্ছার কি এতই অভাব?

শিক্ষকেরা বেশি কিছু চাইছেন না, শুধু এই দেশের মাটিতে একটু সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছেন। এটা কি খুব বেশি চাওয়া হলো?

প্রথম আলো
২৮ জুন, ২০০৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একটি নির্বাচনী মেনিফেস্টো

আমরা মুখে কথা বলার সময় দু-চারটা ইংরেজি শব্দ বলে ফেলি, কিন্তু যখন বাংলা লিখি তখন চেষ্টা করি সেখানে যেন ইংরেজি শব্দ ঢুকে না যায়। তার পরও ওই লেখাটার শিরোনামে বাংলায় 'ইশতেহার' না লিখে ইংরেজিতে 'মেনিফেস্টো' লিখেছি, তার একটা কারণ আছে– ইশতেহার কথাটার একটা গাম্ভীর্য আছে, একটা ঐতিহ্য আছে। আমার হালকা কথাবার্তা দিয়ে এত সুন্দর শব্দটার অপমান করতে ইচ্ছে করছে না।

নির্বাচন আসছে, বোঝা যাচ্ছে– খবরের কাগজে দেখেছি, জেনারেল এরশাদ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। স্বীকার করতেই হবে, জেনারেল এরশাদের বুকের পাটা আছে– খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমাদের রাষ্ট্রপতি কোমায় চলে গিয়েছিলেন, এটা জানার পরও তিনি পিছপা হননি। সেখানে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমি জানি না। কেন জানি সন্দেহ হয়, দেশটাকে কীভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সম্পদের উন্নতি করা যায়, এই ধরনের কিছু আলোচনা হয়নি। কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, সেসব নিয়েই নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। দেশের মানুষের জন্য কি আর কেউ রাজনীতি করে, সবাই রাজনীতি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে। নির্বাচনের আগে কি রাজনৈতিক দলগুলো শুধু হিসাব-নিকাশ আর সিট ভাগাভাগিই করবে? দেশের মানুষকে কী দেবে, সেটা বলবে না? নির্বাচনী ফাঁপা প্রতিশ্রুতি নয়, একেবারে সত্যিকারের আদর্শগত প্রতিশ্রুতি? দেশের মানুষের কাছে এক ধরনের অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা, নির্বাচনী মেনিফেস্টো?

আমি জানি, কোনো রাজনৈতিক দল আমাকে তাদের মেনিফেস্টো লিখতে দেবে না, কিন্তু তাই বলে আমি আমার নিজের মতো করে লিখতে পারব না, সেটা তো কেউ বলেনি। চেষ্টা করতে দোষ কী? যদি শুরু করি, আমার মনে হয়, সেটা হবে এ রকম

BanglaBook.org

১. দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে। তেল-গ্যাস-সম্পদ দেশে থাকবে নাকি বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার থাকবে, নাকি পুরো দেশটিকে সাম্প্রদায়িক করে তোলা হবে– এসব সিদ্ধান্ত হচ্ছে রাজনৈতিক। অথচ আমাদের এমনই কপাল খারাপ যে, যারা এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নেন, সেই রাজনৈতিক নেতাদের এই দেশের কোনো মানুষ বিশ্বাসও করে না, সম্মানও করে না। (ভয় পায় এবং তোষামুদ করে, সেটা অন্য কথা।) কাজেই যেভাবেই হোক, রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে এই বিশ্বাস আর সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপটি হবে এ রকম ক্ষমতায় এসে সংসদে প্রথম দিনেই আইন করে তারা তাদের বেতন কমিয়ে আনবেন এবং শুল্কমুক্ত গাড়ি আনার যে কুৎসিত, জঘন্য এবং রীতিমতো অশ্লীল একটা সিদ্ধান্ত আছে, সেটা বাতিল করে দেবেন। দেশের শিক্ষকেরা যদি কাজের বুয়ার চেয়েও কম বেতনে দিন চালাতে পারেন, তাহলে তাদের এত বেতন, এত সুযোগ-সুবিধার দরকার কী? এত বড় একটা মহান দায়িত্ব পেয়েছেন, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

২. নির্বাচনে কোনো ব্যবসায়ীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না। 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'– এ রকম কবিতার একটা লাইন আছে, সেভাবে বলা যায়, 'ব্যবসায়ীরা দোকানে সুন্দর, রাজনীতিবিদরা সংসদে'। (কবিতাটির ছন্দ হয়তো খুব উচ্চ মানের হলো না কিন্তু অর্থটা নিশ্চয়ই বোঝানো গেছে।) কোটিপতি ব্যবসায়ীরা যখন বস্তা বস্তা টাকা ঢেলে নির্বাচনে জিতে আসেন, তখন সারাক্ষণই তারা ব্যস্ত থাকেন সেই বস্তা বস্তা টাকা ১০০ গুণে তুলে আনতে। আলুর ব্যবসা, পটলের ব্যবসা, সিএনজির ব্যবসা, সিন্ডিকেট করে টু পাইস কামাই করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কেন তারা এত সুন্দর সংসদ ভবনটাকে অপবিত্র করতে আসেন?

৩. প্রত্যেক মনোনীত প্রার্থী তাদের টাকাপয়সার হিসাব দেবেন। যদি দেখা যায়, হিসাবে গোলমাল আছে, তাহলে ১০-১২ হাজার টাকা ফাইন নয়, একেবারে সাংসদ পদটি চলে যাবে। যাদের বুকের পাটা আছে তারা বুকে থাবা দিয়ে এ রকম অঙ্গীকার করবে!

৪. নির্বাচিত হলে এমন একজন রাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, যার মেরুদণ্ড শক্ত এবং মাথা উঁচু, যিনি দলবাজি করেন না, যিনি সৎ আর সাহসী,

BanglaBook.org

যাকে ধমক দিয়ে জেনারেলরা ক্ষমতা নিতে পারবেন না, যিনি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে তার প্রতিরোধ করার সাহস রাখবেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জিন্টুদের যিনি কৌশলে ক্ষমা করে দেবেন না। রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক একটা পদ হতে পারে কিন্তু এটা দেশের সবচেয়ে বড় পদ, কাজেই এই পদের মানুষটিকে হতে হবে মানসম্মান আত্মসম্মানে সবচেয়ে বড়। এমন একজন মানুষকে এই পদটির জন্যে খুঁজে বের করা হবে, যার ব্যক্তিত্বের সামনে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরাও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে থাকবেন।

৫. এই দেশের পড়ালেখার অবস্থা একেবারে ভয়াবহ। পড়ালেখার পুরো ব্যাপারটাই চলে গেছে বড়লোকদের কাছে। যার বাবার টাকাপয়সা আছে, তারা ইংলিশ মিডিয়াম, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইন ধরে ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। আর যারা হতদরিদ্র, তারা বিনি পয়সায় থাকা-খাওয়ার সুযোগটুকুর জন্যে কওমি মাদ্রাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে যারা বাংলা ভাইয়ের খপ্পরে পড়ে, তাদের অবস্থাটা তো সবাই জানে। এর মাঝখানে আটকা পড়ে মধ্যবিত্তদের ছেলেমেয়েরা। একদিকে প্রাইভেট কোচিংয়ের চাপ, অন্যদিকে মুখস্থ করার যন্ত্রণা– কী নিরানন্দ এই দেশের ছাত্রছাত্রীদের জীবন!

তাদের এই নিরানন্দ জীবন ঘুচিয়ে দেওয়া হবে, এই দেশে যদি সৃজনশীল ছেলেমেয়েদের ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে পারা যায়, তাহলেই এই দেশটা দাঁড়িয়ে যাবে। তবে সেটা মুখের কথাতে হবে না, তার জন্যে টাকা খরচ করতে হবে। তাই বাজেটের বিশাল একটা অংশ রাখা হবে শিক্ষার পেছনে।

শিক্ষক ছাড়া কিন্তু শিক্ষা হয় না, তাই সবার আগে শিক্ষকদের চমৎকার একটা বেতন স্কেল দেওয়া হবে। সেই বেতন স্কেলটি এত ভালো হবে যে, দেশের সবচেয়ে মেধাবী মানুষ, সবচেয়ে সৃজনশীল মানুষগুলো মোবাইল কোম্পানির চাকরি ছেড়েও শিক্ষার কাজে চলে আসবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর মতো আনন্দ আর কিসে আছে?

৬. আমাদের দেশের যে কটি বড় বড় সম্পদ রয়েছে, তার একটি হচ্ছে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভবিষ্যৎ এবং স্বপ্ন সবকিছু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের খুবই কপাল খারাপ যে, একটি একটি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

BanglaBook.org

এই ধ্বংসযজ্ঞ এত নিখুঁত যে, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কে না-জানি কত চিন্তাভাবনা করে এই ধ্বংসযজ্ঞের নীল নকশাটা তৈরি করেছে! এই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় একজন চরম দলীয় এবং পরম অপদার্থ ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়োগ দিয়ে। এই ভাইস-চ্যান্সেলররা এতই অপদার্থ যে, বাংলাদেশের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টি ভাইস-চ্যান্সেলর বিতাড়িত হয়েছেন– আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সারা পৃথিবীতে আর কোথাও এ রকম নজির নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করা খুব সহজ, শুধু প্রয়োজন ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে একজন সত্যিকারের শিক্ষাবিদের এবং সেটাই করা হবে। (আমি জানি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের অনেকেই আশা করে আছেন, আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি খুলে দেবার জন্যে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করব। তাদের অনেকের ধারণা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করলে কাজ হয়– সেটি সব সময় সত্যি নয়, যখন সজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলা হয়, তখন শত লেখালেখিতে কোনো কাজ হয় না। পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্রের মৃত্যুর পর কোন অবস্থায় ভাইস-চ্যান্সেলর পদত্যাগ করেছিলেন এবং কেন আবার ক্যাডার পরিবেষ্টিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন, সেটি সরকার খুব ভালো করে জানে। এখানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে কি না, সেটাও সরকার জানে। কেন জানি মনে হয়, সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে খরচের খাতায় তুলে রেখেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন কবে কীভাবে খুলবে সেটি কেউ জানে না। তাই একজন শিক্ষক হিসেবে শুধু এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের কথা দিতে পারি, যদি এটা খোলে, তাহলে তাদের যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে সেই সময়টুকু পুষিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব। না, এই অংশটুকু মেনিফেস্টোর অংশ নয়।)

৭. যারা তেল-গ্যাস বিশেষজ্ঞ, তাদের অনেকে অনুমান করেন, বাংলাদেশের মাটি আর সমুদ্রের নিচে রয়েছে তেল আর গ্যাসের বিশাল মজুদ। দরিদ্র দেশ, তাই কখনো ভালো করে জরিপ করা হয়নি বলে কেউ খবর রাখে না। বিশেষ করে অনুমান করা হয় যে গভীর সমুদ্রের নিচে আমাদের জন্যে বিশাল তেল আর গ্যাস সম্পদ অপেক্ষা করছে। তাই যখন দেখি, আমাদের সমুদ্রসীমায় পাশের দেশ মিয়ানমার ও ভারতবর্ষ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সরকারকে প্রায় ঠেলেঠুলে এর প্রতিবাদ করার জন্যে জাগাতে হচ্ছে, তখন কেমন জানি আতঙ্ক হয়। আমাদের

BanglaBook.org

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা এই সম্পদ বিদেশি প্রভুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। মাগুরছড়া-টেংরাটিলা বিস্ফোরণে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কোনো বিদেশি কোম্পানিকে সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় নাই। বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এমন সব চুক্তি করা হয় যে দেখা যায়, তেল-গ্যাস তুলে তারাই সব নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের জন্যে শুধু ছিবড়েটুকু রয়ে গেছে।

এই সব যন্ত্রণার শেষ হয়ে যেত যদি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান, আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞ দিয়ে এই মূল্যবান সম্পদগুলো তুলে আনতে পারত। আমাদের দেশ তো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো নয়, এখানে অসংখ্য মেধাবী মানুষ আছে, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে বিশেষজ্ঞ করে তেলগ্যাস ক্ষেত্রে জনশক্তি তৈরি করা যায়। অস্বীকার করছি না, এই প্রযুক্তি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, এই মুহূর্তে দরিদ্র দেশের নাগালে হয়তো নেই– কিন্তু একদিন যেন আমাদের নাগালে আসে, তার ভিত্তিটুকু এখনই গড়ে তোলা হবে।

৬. বাংলাদেশের পথেঘাটে গাড়ি একসিডেন্ট এবং নদীতে লঞ্চ-ট্রলার ডুবে যত মানুষ মারা যায় সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও এত মানুষ মারা যায় না। মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী বোমা মেরে ট্রেনে শ' দুয়েক মানুষ মরেছে, একই দিনে জয়পুরহাটে বাসের সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা লেগে প্রায় ৩০ জন মানুষ মারা গেছে। আমাদের দেশে মানুষের মৃত্যুর জন্যে সন্ত্রাসীর বোমার প্রয়োজন নেই– দৈনন্দিন দুর্ঘটনাই যথেষ্ট। যারা এই দেশের রাস্তাঘাটে চলাফেরা করেছেন, তারা জানেন, এই দেশের ড্রাইভারেরা কেমন বেপরোয়া। একসিডেন্টে এত মৃত্যু, এত পঙ্গু মানুষ কিন্তু দেশে সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। তার কারণ এই একসিডেন্টগুলোতে মারা পড়ে সাধারণ অসহায় দরিদ্র মানুষ, তাদের ভালোমন্দ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না! দেশটাকে একটি সভ্য মানুষের দেশ হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্যে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। আইন করা হবে একসিডেন্টে প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর জন্যে গাড়ি-লঞ্চ মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বিশাল ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রতিটি পঙ্গু মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি একটি লঞ্চডুবির পর একটি লঞ্চ-মালিক এবং একটি বাস একসিডেন্টের পর একজন বাস-মালিক সর্বস্বান্ত হয়ে যান, মনে হয়, শুধু তাহলেই তাদের টনক নড়বে।

৯. আমাদের স্বাধীনতা দিবস আছে, বিজয় দিবস আছে, মাতৃভাষা দিবস আছে, এমনকি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসও আছে। কিন্তু আমাদের কোনো

BanglaBook.org

'মুক্তিযোদ্ধা দিবস' নেই। পৃথিবীর সব দেশই তাদের বীরদের স্মরণ করার জন্যে, শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে একটি দিন আলাদা করে রাখে, আমরা রাখিনি। বছরের একটি দিন আমরা মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে পালন করব সেই দিনটিতে আমরা সবাই যারা এই দেশের জন্যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, তাদের সম্মান জানাব, ভালোবাসা জানাব। যারা এই দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছেন তাদের বলব, আমরা হয়তো তোমাদের যথাযথ সম্মান দেখাতে পারিনি কিন্তু এই দেখো, অন্তত একটি দিন আমরা তোমাদের সম্মান আর ভালোবাসা দেখানোর জন্যে আলাদা করে রেখেছি।

১০. বাংলাদেশে মোবাইল কোম্পানিগুলোর নাম-পরিচয় এবং লেবাস বাংলাদেশি হলেও সেগুলো আসলে বিদেশি কোম্পানি। তারা আমাদের ক্রমাগত বুঝিয়ে যাচ্ছে, 'প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে টেলিফোনে কথা বলো এবং তুমি যত বেশি কথা বলে যত টাকা খরচ করবে ততই তোমার লাভ!' কেউ টের পাচ্ছে না মোবাইল টেলিফোনে কথা বলে এই জাতি যত ব্যয় করছে, তার একটা বড় অংশ দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে! ঢাকা শহরের বড় বড় বিলবোর্ডে যে সুদর্শন বিদেশিদের ছবি দেখা যায়, তারা এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষের অর্থ সুকৌশলে নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি মোবাইল কোম্পানিদের যথেচ্ছ লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হবে, যেন দেশের টাকা দেশের ভেতরেই থাকে এবং দেশের ভেতরেই আবার বিনিয়োগ হয়। (মোবাইল টেলিফোন কোম্পানিরা পত্রপত্রিকায় এত বিজ্ঞাপন দেয় যে তাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হলে সেটা নাকি পত্রিকায় ছাপা হয় না। দেখা যাক সেটা সত্যি কিনা।)

১১. এই দেশে জিনিসপত্রের যে আকাশ-ছোঁয়া দাম, সেটা আর সাধারণের নাগালের ভেতরে নেই। দেখতে দেখতে দেশটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে– এক ভাগের জন্যে মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ কোনো সমস্যা নেই; অন্য ভাগ কখনো মাছের বাজারেই ঢোকেন না, ইলিশ মাছ খেতে কেমন, তাদের সন্তানেরা সেটা ভুলেই গেছে! কাজেই জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের লাগামের ভেতরে নিয়ে আসা হবে...।

দেখাই যাচ্ছে নির্বাচনী মেনিফেস্টো লিখতে বসলে সেটা থামানো কঠিন হয়ে পড়ে, একটার পর একটা আসতেই থাকে। আমাদের চারপাশে কত সমস্যা, সেগুলোর সমাধানের জন্যে আমরা ব্যাকুল হয়ে থাকি। এক ডজন শেষ করার

BanglaBook.org

আগেই কাগজ শেষ– এখনো বিদ্যুতের কথা বলা হলো না, ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কথা বলা হলো না, আইনশৃঙ্খলার কথা বলা হলো না, পুলিশের অত্যাচারের কথা বলা হলো না, বিটিভির অনুষ্ঠানের কথা বলা হলো না, অসুখ-বিসুখ চিকিৎসার কথা বলা হলো না– এই তালিকা কি চট করে শেষ হবে?

কিন্তু আমার ভারি অবাক লাগে, যখন দেখি, এই সমস্যাগুলোর কথা রাজনৈতিক নেতারা বলেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেউ কিছু নিয়ে আলোচনা করেন না। গণতন্ত্রের পুরো ব্যাপারটা কমতে কমতে সেটা শুধু ভোটের এক দিনের মাঝে আটকা পড়ে গেছে! তার পরে সবাই একেকজন মোগল বাদশাহদের মতো। মনে হয়, এই দেশের সবকিছুর মালিক তারা! অথচ আমরা ভুলতেই বসেছি যে সবকিছুর মালিক আমরা, সাধারণ মানুষেরা! যতদিন সাধারণ মানুষেরা তাদের এই ক্ষমতাটার কথা টের না পাবে, ততদিন মনে হয় রাজনৈতিক নেতারা কতগুলো সিট কীভাবে ভাগাভাগি করে ক্ষমতায় যাবেন, শুধু সেই পরিকল্পনা (কিংবা সেই ষড়যন্ত্রই) করতে থাকেন।

মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমাদের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়টা বুঝি একটা মিনি বাংলাদেশ। ভাইস-চ্যান্সেলরদের ক্যাডার দিয়ে তার গদিতে বসানোই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা, পরীক্ষা হলো কি না সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। ভাইস-চ্যান্সেলরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ভাইস চ্যান্সেলর– সেই কথাটা মনে হয় সবাই ভুলেই গেছে!

প্রথম আলো
১৪ জুলাই, ২০০৬

BanglaBook.org

একজন ভাইস চ্যান্সেলর

প্রায় ১২ বছর আগের কথা। আমি আমেরিকা থেকে বাক্স-পেটরা গুটিয়ে দেশে চলে এসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। একজন মানুষকেও চিনি না। একদিন দুপুরবেলা বের হয়েছি, দেখি একজন ছোটখাটো মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন স্যুট-টাই পরে, কিন্তু পায়ে তার টেনিস সু। আমি পোশাকের এক্সপার্ট নই। কবে নিজে স্যুট-টাই পরেছি মনে করতে পারি না। এত বয়স হয়েছে, এখনো টাইয়ের নট বাঁধতে পারি না, কিন্তু এটুকু অন্তত জানি যে, স্যুট-টাই পরলে পায়ে টেনিস সু পরা যায় না; খাঁটি চামড়ার চকচকে জুতো পরতে হয়। আমি খানিকটা কৌতুক এবং খানিকটা বিস্ময় নিয়ে এই বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি তখনো জানতাম না এই ছোটখাটো মানুষটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবেন।

কিছুদিনের ভেতরেই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। নাম মো. হাবীবুর রহমান। সমাজকর্ম বিভাগের একজন অধ্যাপক, অত্যন্ত হাসি-খুশি মানুষ। স্যুট-টাইয়ের সঙ্গে টেনিস সু পরারও রহস্য ভেদ হলো। সেদিন ছিল হরতাল, পায়ে হেঁটে ক্যাম্পাসে আসতে হয়েছে। হাঁটার সুবিধের জন্য টেনিস সু পরে চলে এসেছেন, কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান! তিনি অভিজ্ঞ অধ্যাপক কিন্তু কাজকর্ম, কথাবার্তায় কোনো ভারিক্কি ভাব নেই। মানুষটাকে আমার খুব পছন্দ হলো, বয়সে আমাদের বড়, তাই তাকে স্যার ডাকি।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি, তখন বিএনপি সরকার দেশ শাসন করছে। জামায়াতে ইসলামী এখন যেমন বিএনপির হাড়-মাংস চুষে খেয়ে শুধু চামড়াটা রেখেছে ডুগডুগি বাজানোর জন্য, তখন সেরকম অবস্থা ছিল না। বিএনপির নিজস্ব এক ধরনের চরিত্র ছিল, তাদের ছাত্রেরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলত, রাজাকারদের গালাগাল করে একবার একজন চাকু পর্যন্ত খেয়েছিল। এখন সেসব ইতিহাস! যাই হোক, তখন নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়

BanglaBook.org

এসেছে, কানাঘুষা শুনছি আমাদের হাবীবুর রহমান স্যার ভাইস চ্যান্সেলর হবেন। হয়তো হয়েই যেতেন কিন্তু তিনি নিজেই বাদ সাধলেন। আগের ভাইস চ্যান্সেলরের মেয়াদ শেষ হয়নি। তিনি মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলর হতে রাজি হলেন না। অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে, জোট সরকার এবার ক্ষমতায় আসার পর কীভাবে রাতারাতি সব ভাইস চ্যান্সেলরকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং সেই ভাইস চ্যান্সেলররা কীভাবে রাতের অন্ধকারে অফিসগুলো দখল করেছিল। যাই হোক, মো. হাবীবুর রহমান যখন কিছুতেই আগের ভাইস চ্যান্সেলরকে হটিয়ে অফিসে ঢুকতে রাজি হলেন না, সরকার তখন তাকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর করে দিল।

যখন সরকারের পরিবর্তন হয়, তখন ছাত্রদের হলেও ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। একদিন রাতে তাই হলে প্রচণ্ড মারপিট, গোলাগুলি করে আগুন জ্বালিয়ে বিপক্ষ দলের সবাইকে বের করে দেওয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম ঘটনা এত নিত্যনৈমিত্তিক যে, কেউ আর গুরুত্ব দিয়ে নেয় না। একটা তদন্ত কমিটি করে ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয় এবারও সেরকম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে আমাকে। আমি এত কিছু বুঝি না, কমিটির অন্য শিক্ষকদের নিয়ে সত্যি সত্যি তদন্ত করে বিশাল এক রিপোর্ট জমা দিয়ে দিলাম! জনা বিশেক ছাত্র অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, রিপোর্টে আমরা কমিটির লোকজন তাদের বহিষ্কারের সুপারিশ করে বসে আছি।

আগের ভাইস চ্যান্সেলর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখে রেখে তার মেয়াদ শেষ করে সসম্মানে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বটি এসে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের ওপর। সবাই ধরেই নিল হাবীবুর রহমান স্যার নীতিবান মানুষ, কথাটি সত্যি কিন্তু নিশ্চয়ই নির্বোধ নন। এ রকম অবস্থায় সরকারী দলের ছাত্রদের শাস্তি দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার সুযোগটি নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে তিনি শৃঙ্খলা বোর্ডের মিটিং করলেন, সিন্ডিকেট করলেন এবং সরকারি দলের প্রায় ২০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করে দিলেন। তারপর যা হওয়ার তাই হলো, মাস্তান ছাত্ররা ক্যাম্পাস দখল করে নিয়ে আমাকে এবং প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বসে থাকল!

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের শাস্তি তুলে নেওয়ার জন্য প্রফেসর মো.

Banglaboi.org

হাবীবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে শুরু করল, তিনি রাজি হলেন না। প্রথমে হালকা ভয়ভীতি দেখানো হলো, খুব একটা কাজ হলো না। তখন স্বয়ং স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এবং এলাকার সব সাংসদ প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানকে ডেকে পাঠালেন। তারা বললেন, 'এই ছাত্রদের ক্ষমা করে দিতে হবে।' প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান বললেন, 'আমি পারব না। তদন্ত কমিটি এদের অপরাধী হিসেবে রিপোর্ট দিয়েছে, শৃঙ্খলা কমিটি শাস্তির সুপারিশ করেছে, সিন্ডিকেট শাস্তি দিয়েছে। আমার কিছু করার নেই।' তার কথা শুনে স্পিকার এবং সাংসদেরা চোখ কপালে তুলে ফেললেন, প্রফেসর হাবীবুর রহমান ভ্রূক্ষেপ করলেন না। একজন সাংসদ বললেন, 'আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, ভাইস চ্যান্সেলর সব সময় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজকর্ম করতেন।' প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান শীতল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাজটি কি ভালো হতো বলে আপনার ধারণা?'

যখন কিছুতেই প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানকে রাজি করানো গেল না, তখন নেতৃবৃন্দ তাকে খাগড়াছড়ি বা সে রকম কোনো বিজন এলাকায় বদলি করে দেওয়ার প্রস্তাব করল এবং একসময় বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর শিক্ষকদের কোথাও বদলি করা যায় না। এই ছোটখাটো প্রফেসর মানুষটি তার সিন্ডিকেট নিয়ে যদি দোষী ছাত্রদের ক্ষমা না করেন, পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই কিছু করার। বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত কঠিন বস্তু!

ব্যাপারটি কীভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল আমার পরিষ্কার জানা নেই। শুনেছি অনেক ওপর থেকে মাস্তান ছাত্রদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ঝামেলা না করে বিদায় হতে। একসময় তারা বিদায় হলো এবং আবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলাম। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, সরকারের এত বড় বড় হর্তাকর্তার হুমকি-ধামকিতে মাথা নিচু না করার অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাকে নিশ্চয়ই ভাইস চ্যান্সেলর করা হবে না। কিন্তু খুব বিস্ময়ের ব্যাপার, তাকে ভাইস চ্যান্সেলর করা হলো– সরকারের ওপরের দিকে কেউ না কেউ ছিল, যে বিশ্বাস করত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াটা অপরাধের লক্ষণ নয়, সাহসের লক্ষণ। সাহসী ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চমৎকার একটা বিষয় হতে পারে এবং হয়েছিলও তাই।

আমি বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরদের কথা একটু না বলে পারছি না। এই

BanglaBook.org

এলাকায় কোনো মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী এলেই তারা সেখানে ডিউটি করতে চান। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এলেই তারা এয়ারপোর্টে ফুলের তোড়া নিয়ে ছুটে যান। এখন এই ব্যাপারগুলো দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মনে আছে প্রথম বার যখন ঘটেছিল আমি ফোন করে ভাইস চ্যান্সেলরদের কাছে প্রতিবাদ করেছিলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোন ব্যাপারটি নিয়ে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম তারা সেই ব্যাপারটাই ধরতে পারেননি!

২

প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার পর তার সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়াঝাটি হয়েছে। দরিদ্র দেশের দরিদ্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, এক গাদা ছাত্রছাত্রী ছাড়া তার আর কিছু নেই। শিক্ষক নেই, ল্যাব নেই, ল্যাবে যন্ত্রপাতি নেই– সবকিছু নিয়ে আমি চেঁচামেচি করি, গলার রগ ফুলিয়ে আমি ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করি। একদিন একাডেমিক কাউন্সিলে ঝগড়াঝাটি করে আমি ফিরে আসছি, তখন দলবাজি করেন এ রকম একজন শিক্ষক আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি চালিয়ে যান, আমরা আপনার পেছনে আছি!'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমার পেছনে কারও থাকার কোনো দরকার নেই। আমি দলবাজি করার জন্য কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করছি না! আমি তখন আবার প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের কাছে ফিরে গেলাম। ঘরে আর কেউ নেই, আমরা দুজন। আমি বললাম, 'স্যার, আমি আপনার সঙ্গে অনেক ঝগড়াঝাটি করি, কিন্তু স্যার আমার মনে হয় আপনাকে একটা কথা বলা দরকার, আমি আপনাকে অসম্ভব সম্মান করি। ভবিষ্যতেও আপনার সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়াঝাটি হবে কিন্তু স্যার মনে রাখবেন, আপনার জন্য আমার শ্রদ্ধা এক চুল কমবে না।'

আমার কথা শুনে হঠাৎ প্রফসর মো. হাবীবুর রহমানের চোখে পানি এসে গেল, চোখের পানি আড়াল করার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি কিছু ফাইল টানাটানি শুরু করে দিলেন। এরপরও প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করেছি, ঝগড়াঝাটি করেছি কিন্তু কখনোই আমাদের সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া পড়েনি।

মনে আছে একবার কোনো এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়েছি।

BanglaBook.org

পরদিন খবরের কাগজে তার ছবি বের হয়েছে। সেই ছবি দেখে একজন আমাকে ফোন করে বললেন, 'আপনি করেছেন কী?' আমি বললাম, 'কী হয়েছে?' তিনি বললেন, 'অনুষ্ঠানে আপনার পাশে যে মানুষটা বসে আছে সে সেভেনটি ওয়ানে মানুষ জবাই করত!' শুনে আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। স্বাধীনতাবিরোধী মানুষগুলো এখন সরকারের ঘাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তখন অবস্থা এতটা ভালো ছিল না, সামাজিক সম্মান পাওয়ার জন্য তারা ছোক ছোক করে ঘুরে বেড়াত, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষের ধারে কাছে থাকার জন্য চেষ্টা করত।

সেই ঘটনার পর আমি সাবধান হয়ে গেলাম। এরপর থেকে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত করতে আসত, আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনাদের অনুষ্ঠানে এর আগে কে কে গিয়েছেন, বলবেন?' তাদের অতিথির তালিকায় যদি প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের নাম থাকত আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেতাম এটি সজ্জনদের জায়গা, এটি প্রগতিশীল মানুষের জায়গা, মুক্তবুদ্ধির জায়গা, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের জায়গা! প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের পেছনে পেছনে নিশ্চিন্তে অন্ধের মতো যাওয়া যায়, কোনো পূতিগন্ধময় গর্তে হোঁচট খাওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।

প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান যখন ভাইস চ্যান্সেলর তখন একদিন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, ইন্টারনেট নামে একটা জিনিস আছে, যদি আমাদের এখানে একটা নেটওয়ার্ক করতে পারি তাহলে সেটা আনা যেত– কী মজাই না হতো।' আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন ডায়াল-আপ কানেকশন দিয়ে ই-মেইল করতে পারলেই খবরের কাগজে তার খবর ছাপা হয়ে যেত। ইন্টারনেট অনেক দূরের জিনিস। প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান সমাজকর্ম বিভাগের মানুষ, তথ্যপ্রযুক্তির এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে নেবেন কি না সেটা আমি জানি না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে নেটওয়ার্ক করার জন্য আমাকে ১৬ লাখ টাকা জোগাড় করে দিলেন। সেই টাকা দিয়ে আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসালাম। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ তখন আমাদের রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। আমার মনে হলো তার অফিস থেকে যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ই-মেইল পাঠানো হতো, তাহলে সেটা দিয়েই আমাদের নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করা যেত! আমি চান্সেলরের অফিসে যোগাযোগ করলাম, তারা রাজি হলেন। কিন্তু ঠিক যখন পাঠানোর সময়

BanglaBook.org

হলো, সেই অফিস বেঁকে বসল, কোনো ই-মেইল এল না। চ্যান্সেলরের আশীর্বাদ ছাড়াই ভাইস চ্যান্সেলর সেই নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করলেন!

প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান থাকাকালীন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল তৈরি করার শখ হলো। পরিচিত একজন আর্কিটেক্ট স্কুলের একটা ডিজাইন করে দিয়েছে, সেই কাগজের টুকরোটি ছাড়া কিছু নেই। আবার আমরা আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মো. হাবীবুর রহমানের কাছে ধরনা দিলাম। এখান থেকে ওখান থেকে টাকা জোগাড় করে স্কুলের বিল্ডিং দাঁড় করানো হলো। বাচ্চাদের বসার জন্য রঙিন ফাইবারের চেয়ার-টেবিল কেনা হলো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রথমে লিখিত পরে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে উৎসাহী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলো। ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলো, তারা সব স্কুলের পোশাক পরে প্রথম দিন স্কুলে এসেছে, উৎসাহে আমরা পা মাটিতে ফেলতে পারি না! স্কুলের জন্য বিশাল একটা ঘণ্টা কেনা হয়েছে, আমরা আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানকে ধরে এনেছি, ক্লাস শুরুর প্রথম ঘণ্টাটি দিয়ে তিনি আমাদের স্কুলটি শুরু করে দেবেন! প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের কী মনে হলো কে জানে, তিনি ক্লাস শুরুর ঘণ্টা না বাজিয়ে ঢং ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন! ছুটির ঘণ্টা দিয়ে শুরু হয়েছে এ রকম স্কুল আর কোথায় আছে?

একটা জিনিস শুরু করা সহজ, চালিয়ে যাওয়া ভারি কঠিন। স্কুলের বেলাতেও সেই একই সমস্যা। ভালো শিক্ষকের জন্য বেতন অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে, টাকা পয়সার টানাটানি হওয়ার অবস্থা। তখন হঠাৎ একদিন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠিয়ে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে বললেন, এটা স্কুলের ফান্ডে রেখে দেন, কাজে লাগবে! আমার শুধু উৎসাহটুকু আছে আর কিছু নেই আর যা যা প্রয়োজন সব দিয়েছেন প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান। ক্যাম্পাসে সেই স্কুলে যে ছোট ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, তারা হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবে না এর পেছনে কার কতটুকু ভালোবাসা কাজ করেছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ভবনের নামকরণ নিয়ে একবার কিছু সমস্যা দেখা দিল আওয়ামী লীগের সময়, নতুন ছাত্র হলটির নাম দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এবং বিস্ময়ের ব্যাপার, মৌলবাদীদের সেই নামকরণবিরোধী আন্দোলনের পেছনের প্রধান শক্তি এই আওয়ামী লীগ! কয়েক

BanglaBook.org

বছর আগে ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার সময় তাদের কথা না শোনার রাগটি ঝাড়ার এই মোক্ষম সময়! বরাবরের মতো টার্গেট আমি এবং প্রফেসর হাবীবুর রহমান। এক দিকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মতো মানুষ পত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখছেন, অন্যদিকে মৌলবাদীদের হুঙ্কার। মৌলবাদীদের নিয়ে বিশাল মিটিংয়ে প্রধান অতিথি বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান, সেখান থেকে আমাদের মুরতাদ ঘোষণা করা হলো। ক্যাম্পাসের ভেতরে বসে শুনতে পাই মাইকে ক্রমাগত শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, 'হাবীবুর রহমান-জাফর ইকবাল দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই!' বাসায় বোমা পড়ছে, কারও কোনো নিরাপত্তা নেই সেই ভয়ঙ্কর সময়ে প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান যে ধৈর্য দেখিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা নেই।

না, প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের সঙ্গে আমার এক দড়িতে ফাঁসি হয়নি, তিনি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একাই চলে গেছেন। শেষ মুহূর্তে আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেখানে তার লেখা একটা প্রবন্ধ দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়েছে– প্রবন্ধটির শিরোনাম জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কূটকৌশল। আমি যখন খাম খুলে লেখাটি বের করছি তখন তিনি চলে গেছেন, এই পৃথিবীর কোনো অশুচি সেখানে তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না।

বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির মানুষের, অসাম্প্রদায়িক মানুষের, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের– এখন খুব দুঃসময়। প্রফেসর মো. হাবিবুর রহমানের স্ত্রীর কাছে শুনেছি, জঙ্গি মৌলবাদীরা যেন তার স্বামীর কিছু করতে না পারে, সেজন্য প্রচণ্ড গরমের দিনেও ঘুমানোর সময় তিনি সব জানালা বন্ধ করে দিতেন।

সৃষ্টিকর্তা প্রফেসর মো. হাবিবুর রহমানকে বাংলাদেশের এই নৃশংস শক্তির হাত থেকে রক্ষা করে পরম স্নেহে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি নিশ্চয়ই পরকাল থেকে এক ধরনের কৌতুক নিয়ে এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে ধরনের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের জন্য সম্মানজনক বিশেষণের খুব অভাব। তারা কেউই সত্যিকারের শিক্ষাবিদ নন, প্রায় সবাই দলবাজ, কেউ কেউ লোভী, অনেকেই মেরুদণ্ডহীন-চাটুকার, এক-দুজন প্রায় লম্পট হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিন্দিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকদের জন্য আমি এক ধরনের করুণা অনুভব করি যে, তারা সত্যিকার ভাইস চ্যান্সেলর কেমন হয় সেটি কোনোদিন দেখতে পেলেন না।

BanglaBook.org

আমার বড় সৌভাগ্য, আমি প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের মতো একজন সত্যিকার ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ভবিষ্যতের কালো দিনগুলো দূর করার জন্য প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানদের আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

প্রথম আলো
১১ আগস্ট, ২০০৬

BanglaBook.org

লেখাপড়া নিয়ে ছেলেখেলা

কিছুদিন থেকে ক্রমাগত আমার টেলিফোন বেজে চলেছে, সাংবাদিকেরা ফোন করে জিজ্ঞেস করছেন, 'ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি আর মাস্টার্সের সমান করে ফেলা হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' 'কিংবা কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?' আমি মোটামুটি তোতাপাখির মতো বলে যাচ্ছি, 'আমি মাস্টার মানুষ। লেখাপড়ার বিষয়টা বুঝি, রাজনীতি বুঝি না। এই সিদ্ধান্তগুলো তো লেখাপড়ার সিদ্ধান্ত নয়, এগুলো রাজনীতির সিদ্ধান্ত। আমি এ সম্পর্কে কী বলব?' ব্যাপারটা ভালো হলো, না খারাপ হলো, জিজ্ঞেস করবার আগে কী কারোর জিজ্ঞেস করা উচিত না যে সরকার ইচ্ছে হলেই কি এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে? সরকার যদি হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদে পাস করে ফেলে যে, এখন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ডাক্তারি ডিগ্রির সমতুল্য হয়ে গেল, তাহলেই কি বাংলাদেশের সব ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হয়ে যাবেন? বুকে চিনচিনে ব্যথা হলে আমরা কি ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে যেতে থাকব, আর তারা কি আমাদের অপারেশন থিয়েটারে চেপে ধরে বাইপাস সার্জারি করতে শুরু করবেন? সেটা যদি না হয় তাহলে কেন দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষাকে এত হেলাফেলা করা হবে, আর কোনো নিয়মনীতি না মেনে ইচ্ছেমতো এক ডিগ্রিকে আরেক ডিগ্রির সমান করে ফেলা হবে?

লেখাপড়ার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেবে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ক্ষমতা থাকলেও সে কিন্তু হুট করে ডিগ্রি দিয়ে ফেলতে পারে না। ধরা যাক বাংলাদেশের মোবাইল টেলিফোনের বিশাল দক্ষযজ্ঞ দেখে আমাদের ইচ্ছে হলো, আমরা আমাদের ছাত্রদের কমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি দিই। আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা করতে পারব না। প্রথমে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি থেকে এ ব্যাপারে একটা

BanglaBook.org

সুপারিশ গ্রহণ করে একাডেমিক কাউন্সিল হয়ে সিন্ডিকেটে পাস করিয়ে নিতে হবে। একবার এই বিভাগ খোলার পর তার সিলেবাস প্রস্তুত করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিয়ে সিলেবাস কমিটি করা হয়, সেটা লেখা আছে। তারা অনেক ভাবনা-চিন্তা, গবেষণা করে সিলেবাস তৈরি করেন এবং সেটা ফ্যাকাল্টিতে পাঠান। ফ্যাকাল্টি সেটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলে একাডেমিক কাউন্সিলে পাঠান, একাডেমিক কাউন্সিল সেটাকে গ্রহণ করে এবং সিন্ডিকেট সেটাকে অনুমোদন দেয় তখন সেই বিভাগের জন্য শিক্ষক নেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুম দেওয়া হয়, ল্যাবরেটরি তৈরি হয়, লাইব্রেরিতে বই আনা হয় এবং সাবধানে কিছু ছাত্র ভর্তি করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটির কিছু উনিশ-বিশ হতে পারে কিন্তু কোনো ছাত্রছাত্রীকে একটি ডিগ্রি দেওয়ার এটা হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি। আমাদের সরকারের মন্ত্রিপরিষদ যখন মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নতুন নতুন ডিগ্রির ব্যবস্থা করেছে, তখন কি এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার কথা ভেবেছে? শুধু ইচ্ছে হলেই ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি আর মাস্টার্স বলে ঘোষণা করা যায় না। বড়জোর ফাজিল আর কামিলের ছাত্রদের বলা যায় কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নির্দিষ্ট সিলেবাসের আওতায় থেকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিতে। এই সহজ বিষয়টি কেউ কেন সরকারকে মনে করিয়ে দিচ্ছে না? সারা পৃথিবীতে ডিগ্রি ও মাস্টার্স নিতে যে নিয়মনীতি মেনে নেওয়া হয়, আমাদের দেশে সেই নিয়মনীতি ভেঙে ফেলার জন্য সরকার এত ব্যস্ত হয়েছে কেন?

আসল কারণটা আমরা সবাই জানি। এই সরকার কিছু রাজনৈতিক দল নিয়ে একটা জোট করেছে। সেই জোটের একটি দল জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে, আলিয়া মাদ্রাসার প্রায় পুরোটা তাদের দখলে। কাজেই আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করে যারা বের হবে, তাদের সরকারে বিভিন্ন জায়গায় ঢোকাতে পারলে সরাসরি তাদের মানুষ সরকারের ভেতর ঢুকে যাবে। এর ভেতরে ইসলাম বা শিক্ষার কিছু নেই। এটা সরাসরি রাজনীতি। ঠিক সে রকম, জোট সরকারের আরেক শরিক হচ্ছে ইসলামী ঐক্যজোট। তারা মনে করে, কওমি মাদ্রাসা তাদের দখলে। কাজেই কওমি মাদ্রাসা থেকে পাস করে যারা বের হবে, তাদের যদি সরকারি অনুমোদন থাকে, সরকারের বিভিন্ন জায়গায় তারা ঢুকতে পারবে এবং যদি ঢুকতে পারে, তাহলে সেটা হবে তাদের একটা রাজনৈতিক লাভ। উদ্দেশ্যটা মেটেও ইসলাম বা শিক্ষা নয়, উদ্দেশ্যটা এখানেও রাজনৈতিক। জোট সরকারে

BanglaBook.org

এখন বিতাড়িত স্বৈরাচার এরশাদ আসছে। আমাদের খুব কপাল ভালো, জেনারেল এরশাদের দখলে কোনো স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা নেই। তাহলে এরশাদকে তার চুরিচামারির মামলা থেকে রেহাই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরও সরকারি কোনো ডিগ্রি দিতে হতো!

২

মাদ্রাসার পড়াশোনা নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেই মাদ্রাসায় যারা পড়ছে, সেসব ছাত্রছাত্রীর কী অবস্থা? তারা তো রাজনীতি করবার জন্য মাদ্রাসায় পড়তে আসেনি। তারা তো পড়তেই এসেছে। আমি মাদ্রাসার সিলেবাসগুলো দেখার চেষ্টা করে কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করেছি। বাংলাদেশে তথ্য বিষয়টি খুব সহজে পাওয়া যায় না। কম্পিউটার টার্মিনালের সামনে বসে আমি ইন্টারনেটে অস্ট্রেলিয়া বা জাপানের তথ্য চট করে পেয়ে যাই, কিন্তু আমার একেবারে কাছাকাছি একটা মাদ্রাসার সিলেবাস চট করে পাওয়া যায় না। যারা মাদ্রাসার বই বিক্রি করেন, তাদের কাছে সিলেবাসের কপি রয়েছে। যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য বই বিক্রি করা, তারা মাদ্রাসা বোর্ডের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কিছু বই গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের তালিকা অনুযায়ী এবতেদায়ি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর একটা ছোট শিশুকে মোট ১৩টি বই পড়তে হয়। না, আমি ভুল করিনি। তালিকায় সত্যি সত্যি মোট ১৩টি বই রয়েছে। যদি পুস্তক বিক্রেতার নিজস্ব বইগুলো সরিয়ে শুধু মাদ্রাসা বোর্ডের বইগুলো নিই, তাহলে মোট বইয়ের সংখ্যা হয় আট। প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রের পড়তে হয় ছয়টি বিষয়ের ছয়টি বই। যার অর্থ এবতেদায়ি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর একটি শিশুকে অন্য শিশুর তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি বই পড়তে হয়। বাড়তি যে অংশটি তাদের বেশি পড়তে হয়, সেটি চারুকলা, সংগীত বা শারীরিক শিক্ষার মতো হালকা বিষয় নয়, তার মধ্যে রয়েছে কোরান, ফিক্‌হ ও আরবির মতো কঠিন কঠিন বিষয়। সত্যি কথা বলতে কি, তৃতীয় শ্রেণীতে বাচ্চাটির জীবন একটু সহজ হয়েছে, সে যখন প্রথম শ্রেণীতে ছিল, তাকে প্রাইমারি স্কুলের একটা শিশুর তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ বেশি পড়তে হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের একটা শিশু পড়েছে, তিনটি বিষয়ের তিনটি বই, মাদ্রাসার শিশুরা পড়েছে পাঁচটি বিষয়ের পাঁচটি বই। আমি এবতেদায়ি মাদ্রাসার বইগুলোও

BanglaBook.org

দেখেছি। প্রাইমারি স্কুলের বইগুলো যত সুন্দর এবং যত্ন করে তৈরি, এগুলো তার ধারেকাছে নয়। অযত্নে এবং অবহেলায় তৈরি করা কিছু ভালোবাসাহীন প্রাণহীন শুষ্ক বই। শুধু যে নিচের শ্রেণীর জন্য কথাগুলো সত্যি, তা নয়, দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কথাগুলো সত্যি। তাদের সিলেবাস বড় ও বেশি এবং অনেক বেশি কঠিন।

এই সিলেবাসে পাস করে যারা বের হচ্ছে, তারা কিন্তু সেখানে উচ্চশিক্ষায় আসতে পারছে না। এই সিলেবাসের সংস্কার করা না হলে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা সত্যিকার অর্থে কিছু শেখার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না।

ঠিক কীভাবে বিষয়টা ঘটেছে, আমার জানা নেই। অনুমান করতে পারি যে যারা এই সিলেবাস তৈরি করেন, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, তারা সবাই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তাদের কারও সন্তান মাদ্রাসায় পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়াশোনা নিয়ে সত্যিকার অর্থে তাদের কোনো গরজ নেই। তাই তারা দায়সারা অবাস্তব একটি সিলেবাস তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার আগ্রহে মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সেটা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাদের ব্যবহার করে রাজনীতি করায় ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর উৎসাহের শেষ নেই। কিন্তু তারা কী পড়ছে, সেটা কতটুকু যৌক্তিক, সে ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি দীর্ঘদিন থেকে সাংবাদিকদের অনুরোধ করে আসছি, যারা এই দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সন্তানদের কে কোথায় পড়ে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করতে!

এ তো গেল এবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ের লেখাপড়া। আলিম ও ফাজিলের সিলেবাসে কী আছে? আমি নিজে এ ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার সময় পাইনি বলে দৈনিক সমকালে প্রকাশিত মাওলানা হোসেন আলীর *বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* বইয়ের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, '৭২-এ সংবিধানের অনৈসলামিকতা, এসব বিষয় ফাজিল শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের মূল কথা। এসব বিষয়ের ওপর লেখা নামে-বেনামে প্রকাশিত বেশ কিছু বই রয়েছে, যেগুলো সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্দেশিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ ফাজিল বা ডিগ্রি শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যে শিক্ষিত বা আলেম লোকটি সমাজের অঙ্গনে ফিরে যায় সে তো আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ

BanglaBook.org

ও ভাবাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ নিয়েই ফিরে যায়।...' মাওলানা হোসেন আলীর অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর– যে সরকার, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী সচিব-উপাচার্যেরা মিলে ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমমান করার চেষ্টা করছেন, এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব বোঝার মতো ক্ষমতা তাদের আছে কি না, আমার সেই বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ হয়। দেশের অন্য শিক্ষাবিদেরা বিষয়টা কি একটু দেখবেন মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর প্রতি সহানুভূতি রেখে?

কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে কী আছে, সেই তথ্যটুকু বের করা আরও কঠিন একটি বিষয়। ইসলামকে ব্যবহার করে যারা রাজনীতি করেন, তারা কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রির সরকারি স্বীকৃতি নিয়েই পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন সরকার তাদের সিলেবাসের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। 'আমাদের যা ইচ্ছে হয় আমি পড়াব, কিন্তু আমাকে তোমার স্বীকৃতি দিতে হবে, কারণ ইলেকশনে আমি তোমার জন্য ভোট এনে দেব।' এটি যে একটি যুক্তি হতে পারে, সেটি সারা পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। পত্রপত্রিকা পড়ে জানতে পেরেছি, এক কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসের সঙ্গে অন্য কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসের মিল নেই। যে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিটি সরকারি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে, সেটি নাকি কোথাও দেওয়া হয় ১৬ বছরে, কোথাও ১৪ বছরে আবার কোথাও ১২ বছরে। তাদের বাংলা ভাষা যত্ন করে শেখানো হয় বলে শুনিনি। যে আরবি, ফার্সি বা উর্দু শেখানো হয় সেটাও নাকি আধুনিক এবং মানসম্মত নয়। এ রকম অবস্থায় একটা সরকারি সিদ্ধান্তে কি কোনো নিয়মনীতি ছাড়াই একটা ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া যায়?

কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিটি দেওয়া নিয়ে পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা চোখে পড়েছে। যে জিনিসটি এখানে চোখে পড়েনি, সেটা হচ্ছে এই ডিগ্রি দেওয়ার পদ্ধতিটি নিয়ে। সারা পৃথিবীর নিয়ম এক, প্রথমে ছেলেমেয়েরা স্কুল পড়বে, একসময় স্কুল সার্টিফিকেট পাবে– আমাদের দেশে যেটাকে বলে এসএসসি। তারপর কলেজে পড়ে আবার একটি সার্টিফিকেট পাবে, এখানে সেটার নাম এইচএসসি। তারপর কেউ কেউ উচ্চশিক্ষায় যাবে, সেখানে তিন কিংবা চার বছর পড়ার পর তারা প্রথম একটা ডিগ্রি পাবে, সেটা হচ্ছে স্নাতক। আরও এক বা দুই বছর পড়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবে। পুরো লেখাপড়াটা সাজানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধাপ হিসেবে। একটা ধাপ শেষ করে পরের ধাপে

BanglaBook.org

দেখেছি। প্রাইমারি স্কুলের বইগুলো যত সুন্দর এবং যত্ন করে তৈরি, এগুলো তার ধারেকাছে নয়। অযত্নে এবং অবহেলায় তৈরি করা কিছু ভালোবাসাহীন প্রাণহীন শুষ্ক বই। শুধু যে নিচের শ্রেণীর জন্য কথাগুলো সত্যি, তা নয়, দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কথাগুলো সত্যি। তাদের সিলেবাস বড় ও বেশি এবং অনেক বেশি কঠিন।

এই সিলেবাসে পাস করে যারা বের হচ্ছে, তারা কিন্তু সেখানে উচ্চশিক্ষায় আসতে পারছে না। এই সিলেবাসের সংস্কার করা না হলে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা সত্যিকার অর্থে কিছু শেখার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না।

ঠিক কীভাবে বিষয়টা ঘটেছে, আমার জানা নেই। অনুমান করতে পারি যে যারা এই সিলেবাস তৈরি করেন, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, তারা সবাই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তাদের কারও সন্তান মাদ্রাসায় পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়াশোনা নিয়ে সত্যিকার অর্থে তাদের কোনো গরজ নেই। তাই তারা দায়সারা অবাস্তব একটি সিলেবাস তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার আগ্রহে মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সেটা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাদের ব্যবহার করে রাজনীতি করায় ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর উৎসাহের শেষ নেই। কিন্তু তারা কী পড়ছে, সেটা কতটুকু যৌক্তিক, সে ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি দীর্ঘদিন থেকে সাংবাদিকদের অনুরোধ করে আসছি, যারা এই দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সন্তানদের কে কোথায় পড়ে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করতে!

এ তো গেল এবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ের লেখাপড়া। আলিম ও ফাজিলের সিলেবাসে কী আছে? আমি নিজে এ ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার সময় পাইনি বলে দৈনিক সমকালে প্রকাশিত মাওলানা হোসেন আলীর *বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* বইয়ের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, '৭২-এ সংবিধানের অনৈসলামিকতা, এসব বিষয় ফাজিল শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের মূল কথা। এসব বিষয়ের ওপর লেখা নামে-বেনামে প্রকাশিত বেশ কিছু বই রয়েছে, যেগুলো সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্দেশিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ ফাজিল বা ডিগ্রি শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যে শিক্ষিত বা আলেম লোকটি সমাজের অঙ্গনে ফিরে যায় সে তো আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ

BanglaBook.org

ও ভাবাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শ নিয়েই ফিরে যায়।...' মাওলানা হোসেন আলীর অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর– যে সরকার, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী সচিব-উপাচার্যেরা মিলে ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমমান করার চেষ্টা করছেন, এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব বোঝার মতো ক্ষমতা তাদের আছে কি না, আমার সেই বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ হয়। দেশের অন্য শিক্ষাবিদেরা বিষয়টা কি একটু দেখবেন মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর প্রতি সহানুভূতি রেখে?

কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে কী আছে, সেই তথ্যটুকু বের করা আরও কঠিন একটি বিষয়। ইসলামকে ব্যবহার করে যারা রাজনীতি করেন, তারা কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রির সরকারি স্বীকৃতি নিয়েই পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন সরকার তাদের সিলেবাসের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। 'আমাদের যা ইচ্ছে হয় আমি পড়াব, কিন্তু আমাকে তোমার স্বীকৃতি দিতে হবে, কারণ ইলেকশনে আমি তোমার জন্য ভোট এনে দেব।' এটি যে একটি যুক্তি হতে পারে, সেটি সারা পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। পত্রপত্রিকা পড়ে জানতে পেরেছি, এক কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসের সঙ্গে অন্য কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসের মিল নেই। যে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিটি সরকারি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে, সেটি নাকি কোথাও দেওয়া হয় ১৬ বছরে, কোথাও ১৪ বছরে আবার কোথাও ১২ বছরে। তাদের বাংলা ভাষা যত্ন করে শেখানো হয় বলে শুনিনি। যে আরবি, ফার্সি বা উর্দু শেখানো হয় সেটাও নাকি আধুনিক এবং মানসম্মত নয়। এ রকম অবস্থায় একটা সরকারি সিদ্ধান্তে কি কোনো নিয়মনীতি ছাড়াই একটা ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া যায়?

কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিটি দেওয়া নিয়ে পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা চোখে পড়েছে। যে জিনিসটি এখানে চোখে পড়েনি, সেটা হচ্ছে এই ডিগ্রি দেওয়ার পদ্ধতিটি নিয়ে। সারা পৃথিবীর নিয়ম এক, প্রথমে ছেলেমেয়েরা স্কুল পড়বে, একসময় স্কুল সার্টিফিকেট পাবে– আমাদের দেশে যেটাকে বলে এসএসসি। তারপর কলেজে পড়ে আবার একটি সার্টিফিকেট পাবে, এখানে সেটার নাম এইচএসসি। তারপর কেউ কেউ উচ্চশিক্ষায় যাবে, সেখানে তিন কিংবা চার বছর পড়ার পর তারা প্রথম একটা ডিগ্রি পাবে, সেটা হচ্ছে স্নাতক। আরও এক বা দুই বছর পড়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবে। পুরো লেখাপড়াটা সাজানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধাপ হিসেবে। একটা ধাপ শেষ করে পরের ধাপে

BanglaBook.org

যাবে। কওমি মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা সেই ধাপ কেমন করে শেষ করবে? তারা এসএসসি ও এইচএসসি বা তার সমমানের সার্টিফিকেট কখন পাবে, কোথা থেকে পাবে? স্নাতক ডিগ্রিটাই বা কখন পাবে? সরাসরি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটাই কি তাদের দেওয়া হবে? যদি তা-ই দেওয়া হয়, তাহলে এর থেকে বড় অনিয়ম ও ছেলেখেলা কেউ কি এ দেশে দেখেছে? আমি জানি এ দেশের সরকারের কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না, কিন্তু লেখাপড়া-সংক্রান্ত এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, তার খুঁটিনাটি কাউকে কিছু বলবে না তা তো হতে পারে না।

কওমি মাদ্রাসার ব্যাপারটা এ দেশের সাধারণ মানুষের নজরে আলাদাভাবে এসেছে জেএমবির বোমাতাণ্ডবের পর, কারণ যাদের ধরা হয়েছে, তাদের অনেকেই ছিল কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। খবরের কাগজে যখন তাদের ছবি ছাপা হয়েছে, আমি কিন্তু সব সময়ই তাদের জন্য এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করেছি, তাদের বেশির ভাগই ছিল হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। সাধারণ শিক্ষায় দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে বাবা-মা ফ্রি থাকা-খাওয়ার সুবিধাটুকুর জন্য কওমি মাদ্রাসায় দিয়ে দিয়েছেন। জেএমবির সন্ত্রাসী মানুষজন এই অবস্থায় ছেলেগুলোকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে।

একটি সাধারণ স্কুল-কলেজ থেকে কেন একজন আত্মঘাতী ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী বের হয় না, কেন একটি কওমি মাদ্রাসা থেকে তাদের রিক্রুট করা যায়, আমাদের সেটা বুঝতে হবে। সাধারণ স্কুল-কলেজে আমাদের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলা হয়। তারা আমাদের এই প্রচলিত সমাজকে সম্মান করতে শেখে, ভালোবাসতে শেখে। আমি যতদূর জানি, কওমি মাদ্রাসায় সেটা অনুপস্থিত, তাই তাদের নানা বৈষম্য আর অবিচারের উদাহরণ দেখিয়ে এত সহজে ক্রুদ্ধ করে ফেলা সম্ভব। খবরের কাগজে দেখেছি, কওমি মাদ্রাসায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ ছাত্র পড়াশোনা করে। আমি নিশ্চিত, তাদের জিজ্ঞেস করলে কেউই বলবে না যে তারা বুকে বোমা বেঁধে সাধারণ মানুষকে হত্যা করার স্বপ্ন দেখে। তারা নিশ্চয়ই অন্য দশজনের মতো লেখাপড়া করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সরকারি চাকুরে হতে চায়। আমরা তাদের সেই সুযোগটি করে দিতে পারিনি। তাই জেএমবি যখন তাদের আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হিসেবে রিক্রুট করে, তখন তার খানিকটা দায়দায়িত্ব আমাদেরও নিতে হবে।

BanglaBook.org

লেখাপড়া করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের জ্ঞানটুকু কোথাও ব্যবহার করতে শেখা। আমি কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক। আমার ছাত্রছাত্রীরা যখন এই বিভাগ থেকে পাস করে বের হয়, আমি আশা করি তারা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে। আমরা কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, তারা পরীক্ষা শেষ করে সার্টিফিকেটটা নিজেদের হাতে পাওয়ার আগেই নানা জায়গায় কাজ শুরু করে দিচ্ছে। যারা তাদের কাজ দিচ্ছেন, তারা সার্টিফিকেট বা সনদ নামের সেই ছোট কাগজটুকুর জন্য মোটেও ব্যস্ত নয়। ছাত্রছাত্রীদের যে কাজটুকু জানার কথা তারা তা জানে কি না, সেটাই তাদের একমাত্র মাথাব্যথা। সরকার খুব হইচই করে মাদ্রাসার বিভিন্ন ডিগ্রি দেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছে। তারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, যাদের হাতে সেই ডিগ্রি তুলে দেওয়া হবে, তারা কি পৃথিবীর মানদণ্ডে সেই ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্য? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কি এক ধাক্কায় সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পিছিয়ে দেওয়া হলো না? আমাদের দেশের লেখাপড়ায় মান কমানোর অধিকার এ সরকারকে কে দিয়েছেন?

৩

জোট সরকার তার শাসনের একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসেছে। তাদের শাসনকালের রিপোর্ট কার্ড ভয়াবহ। আমাদের দেশে যতগুলো প্রতিষ্ঠান ছিল, তার প্রায় প্রতিটাকেই তারা নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে দেখেশুনে মনে হয়, তারা বুঝি অন্য কোনো দেশের পক্ষ হয়ে এ দেশ শাসন করে গেছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি আজ সেখানে কোনো পরিবর্তন করা হলে ১০ বছর পর তার গুরুত্ব বোঝা যাবে। লেখাপড়ার বিষয়টি সে রকম। আমরা সবাই চাইছি, আমাদের পড়াশোনা হোক বিজ্ঞাননির্ভর, সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ও উদার। অথচ সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে ঠিক তার উল্টোটুকু করতে। মাদ্রাসাভিত্তিক লেখাপড়াকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমান করে দিয়ে তারা যেন এর শেষটুকু আমাদের দেখিয়ে দিল। আমার ধারণা, এ সিদ্ধান্তটি দিয়ে সরকার মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের এটা খুব ভুল সংকেত পাঠাচ্ছে। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এখন হয়তো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশাবাদী হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে গিয়ে অবধারিতভাবে তারা আবিষ্কার করবে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারের দেওয়া 'সার্টিফিকেট' নামের এই

BanglaBook.org

কাগজটুকু নিয়ে তাদের কোনো লাভই হচ্ছে না, তখন তাদেরই সবচেয়ে বেশি আশাভঙ্গ হবে। হতে পারে তখন তারা বলবে, আমাদের ডিগ্রি দিয়েছ, আমাকে চাকরি দেবে না, এটা তো হতে পারে না! আজ থেকে কয়েক বছর পর সেই আশাহত ক্ষুব্ধ মাদ্রাসা-ছাত্রদের কেমন করে সামলে নেওয়া হবে, কেউ কি ভেবে দেখেছে?

আমাদের রাজনীতিবিদেরা বলে থাকেন, 'রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নেই।' সাদা বাংলায় যার অর্থ, 'ভোটের জন্য দরকার হলে নিজের মাকেও বিক্রি করে দেব।' কিন্তু ভোটের জন্য যদি লেখাপড়াকেও বিক্রি করে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর আর জায়গা থাকবে না।

প্রথম আলো
২ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

এইচএসসি পরীক্ষা, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অন্যান্য

এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, সব খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছেলেমেয়েদের অনন্দোজ্জ্বল মুখের ছবি দেখে আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কথা ভুলে যাই। মনে হয় এই ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে যখন দেশের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে তখন আমাদের বুঝি কোনো দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা থাকবে না। ভাবতে ভালো লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

ছবি দেখা শেষ করে যখন খবরের ভেতরের অংশটুকু পড়া শুরু করি তখন বুকের ভেতর দীর্ঘশ্বাস জমা হয়। এইচএসসিতে শতকরা ৬০ জন পাস করেছে। আমরা সবাই জানি, এ দেশের কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, নতুন শিক্ষক দেওয়া হয়নি, সিলেবাস উন্নত করা হয়নি, শিক্ষকেরা বেশি ক্লাস নেননি, ছাত্ররা বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েনি, তারপরও হঠাৎ করে শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। বোঝাই যাচ্ছে পরীক্ষায় খাতা দেখার প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন করা হয়েছে, সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে বেশি বেশি করে মার্কস দিতে, যেন বেশি বেশি করে ছাত্রছাত্রী পাস করে, আমার তাতেও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যটি পড়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি বলেছেন, তাদের সরকারের শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতার সুফল হচ্ছে এই রেজাল্ট। তিনি দাবি করেছেন, এইচএসসির এই রেজাল্ট প্রমাণ করে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় আগের চেয়ে ভালো করেছে! কেন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এ কথাগুলো বলেন? এ কথাগুলো বলে দেশের মানুষকে প্রতারণা করার অর্থ কী? যারা এইচএসসি পাস করে তারা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কাছে পড়তে আসে। আমরা তো জানি পড়ালেখার একবিন্দু উন্নতি হয়নি! ছাত্রছাত্রীরা কলেজে যায় না, তারা কোচিং পড়ে, ব্যাচে পড়ে। তারা গাইড বই পড়ে, মুখস্থ করে। যাদের প্রাইভেট পড়ার পয়সা নেই তারা ঝুলে পড়ে! এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অহঙ্কার করার কিছু নেই, যখন কেউ অহঙ্কার করে তখন উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ হতে থাকে!

BanglaBook.org

এই সরকার হচ্ছে ঘোষণার সরকার, ঘোষণা দিয়ে ফাজিল-কামিলকে স্নাতক-স্নাতকোত্তরের সমান করে ফেলেছে, ঘোষণা দিয়ে কওমী মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রিকে স্নাতকোত্তর করে ফেলেছে। ঠিক তেমনি স্বাধীনতা যে রকম ঘোষণা দিয়ে হয় না, লেখাপড়াও সে রকম ঘোষণা দিয়ে হয় না। লেখাপড়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। যেখানে যেখানে পরিশ্রম হয়েছে সেখানে ফল এসেছে। তার একটি হচ্ছে নকল বন্ধ করা এবং অন্যটি হচ্ছে সময়মতো রেজাল্ট দেওয়া। যারা এটা করতে পেরেছেন আমি সবসময় তাদের অভিনন্দন জানাই। অন্য কোথাও পরিশ্রম করেনি, তাই অন্য কোথাও উন্নতি হয়নি।

এইচএসসি পাস করার পর ছাত্রছাত্রীরা একমুহূর্তও শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে না, তাদের শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার দুঃস্বপ্ন। এই বছর সেই দুঃস্বপ্ন অনেক বেশি প্রকট, কারণ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে বেশি, জিপিএ ফাইভও পেয়েছে বেশি। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিটসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। কিন্তু সেই ৩০ হাজার সিটই যে সবার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের সিট তা নয়। কাজেই খবরের কাগজে যে হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি দেখেছি, তার অনেকের মুখের মাঝে বেদনার ছায়া পড়বে সেই ছবি আমরা দেখব না, কিন্তু সেগুলো আমাদের তাড়া করে বেড়াবে। কোনো রকম ভবিষ্যতের পরিকল্পনা না করে জোড়াতালি দিয়ে একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করালে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

২

আমাদের গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সেক্রেটারি অনুজপ্রতিম মুনীর হাসান কিছুদিন আগে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পদ্ধতির একটি চমকপ্রদ বিষয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। বিষয়টি এ রকম যেহেতু এগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই দেশের সব ছাত্রছাত্রীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে পড়ার অধিকার আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কোনোভাবেই এমনভাবে তাদের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ফেলতে পারবে না, যেন কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সেখানে পরীক্ষা দিতে না পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা আলাদা দিনে পরীক্ষা দিতে হবে। আমাদের বর্তমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২১। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই কয়েকটি

BanglaBook.org

ইউনিট রয়েছে। যদি গড়ে তিনটি করেও ধরা হয় তাহলে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য (৩×২১=৬৩) ৬৩টি ভিন্ন ভিন্ন দিন দরকার। পরীক্ষা নেওয়া হয় ছুটির দিনে, শুক্রবারে। কাজেই আমাদের দরকার ৬৩টি শুক্রবার। মজার ব্যাপার হলো, একটা বছরে শুক্রবারের সংখ্যা ৫২, অর্থাৎ আমরা সারা বছর ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শেষ করতে পারব না!

কাজেই যা হওয়ার তাই হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিভাগে পরীক্ষা দিতে পারছে না। অথচ খুব সহজেই এ সমস্যার সমাধান করা যেত- সেটি হচ্ছে সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে 'একটি' ভর্তি পরীক্ষা। মেডিকেল কলেজগুলো অনেকদিন থেকে সেটা নিয়ে আসছে কাজেই এটা যে সম্ভব সেটা বহু আগেই প্রমাণ করে রাখা আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশাল ভর্তি পরীক্ষা নিতে হলে অবশ্যই তার অনেক খুঁটিনাটি সমস্যা সমাধান করতে হবে। কিন্তু সেটি কোনো ব্যাপারই নয়। ২১টি ইউনিভার্সিটির বাঘা বাঘা প্রফেসর একসঙ্গে বসে কয়েকদিন আলাপ-আলোচনা করলেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। এ রকম একটি পরীক্ষা নেওয়া হলে এ দেশের ছাত্রছাত্রী আর তাদের অভিভাবকদের যে কত বড় একটা উপকার হবে, সেটা একেবারে আক্ষরিক অর্থে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, একজন পরীক্ষার্থী কিংবা তাদের মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আমাদের দেশে পড়ালেখাটা বিত্তশালীদের হাতে চলে গেছে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যে হাস্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়েদের ছবি ছাপা হয়, তারা সবাই সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়ে। ৬০ ভাগ ছেলেমেয়ে পাস করার অর্থ ৪০ ভাগ ছেলেমেয়ে ফেল করা। এই ফেল করা ছেলেমেয়েগুলো গ্রামের ছেলেমেয়ে, দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে। স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে অল্প কিছু দরিদ্র ছেলেমেয়ে এইচএসসি পাস করেছে, তারা কিন্তু সারা দেশ ঘুরে ঘুরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে না। অনেক কষ্ট করে ভর্তির ফরম জোগাড় করে তার বাড়ির কাছাকাছি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। যদি সেখানে টিকতে না পারে তাহলে তার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয় না। যারা দরিদ্র তারা এই ভর্তিযুদ্ধে সবার আগে পরাজিত হয়। কিন্তু যদি সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি ভর্তি পরীক্ষা নিত, তাহলে এই অসহায় দরিদ্র ছাত্রছাত্রীগুলো একটা সত্যিকারের সুযোগ পেত। আমরা তো সবসময়ই সবকিছু করছি বিত্তশালীদের জন্য- অন্তত

BanglaBook.org

একবার কি দেশের দরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না?

আমি এই বেলা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার একটা গোপন তথ্য ফাঁস করে দিই। বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে বের করার জন্য ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় না, ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় কিছু পয়সা কামাই করার জন্য। 'শিক্ষাকে পণ্য করা'র জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গালাগাল করেন, ভর্তি পরীক্ষার সময় তারা কী ধরনের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন সেটি একটি দর্শনীয় বিষয়। যারা সারা বছর ক্লাস নেন না, তারা ভর্তি পরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরে খাতা দেখেন, ডিউটি করেন। ভর্তি ফরমের দাম বাড়িয়ে দেন, ইউনিটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন, কেউ কেউ বিভাগ অনুযায়ী পরীক্ষা নিতে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের গলা কাটার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর একটিও নেই! আমি নিজে একটু গাধা টাইপের বলে ব্যাপারটি প্রথমে বুঝতে পারিনি, যেদিন বুঝতে পেরেছি সেদিন থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে সরে এসেছি।

আমি জানি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারী আমার এ মন্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু সত্যটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। আমি সাংবাদিকদের অনুরোধ করব, তারা যেন ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। একটা বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলো ফরম বিক্রি করে কত টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং ভর্তি পরীক্ষার নাম করে তারা কী হারে নিজেদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি করে নেয় সেটা সবার জানা দরকার। একেবারে কোনো কাজ না করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকারবলে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছেন! প্রশ্নপত্রগুলো কী রকম, গাইড বই থেকে উন্নত কি না এবং এই ভর্তি পরীক্ষায় আদৌ মেধাবী ছাত্রদের বেছে নেওয়াটাই সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি না– সাংবাদিকদের এ তথ্যগুলোও খুঁজে বের করা দরকার। শুধু তা-ই নয়, এই ভর্তি পরীক্ষার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা কতটুকু মূল্যবান সময় অপচয় করেন, সেটা জানলে সবাই হতবাক হয়ে যাবেন। ভর্তি পরীক্ষার এই ভেতরকার বিষয়গুলো সবাই জানলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা চাপ দেওয়া সম্ভব, যেন তারা সবাই মিলে একটা

BanglaBook.org

ভর্তি পরীক্ষা নেয়। কিছুদিনের ভেতরই একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে, তারা কি এই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এ দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের একটা বিশাল যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না?

৩

সেদিন কিছু ছাত্রছাত্রী আমার কাছে ফোন করে বলেছে, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তারা সবাই ফিজিওথেরাপির ছাত্র। খবরের কাগজে গত কয়েক দিনে তাদের সম্পর্কে কিছু খবর ছাপা হয়েছে। যেহেতু তাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে খুব বেশি পরিচিত নই, তাই সমস্যাটি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি– তাদের ওপর একটা অন্যায় করা হয়েছে, এ রকম একটা আভাস পেয়েছি। আমি যেহেতু মাঝেমধ্যে রেগেমেগে পত্রিকায় লেখালেখি করি, তাদের ধারণা হয়েছে বিষয়টি আমাকে বলা দরকার। তাদের মুখে পুরো বিষয়টি শুনে আমি নিশ্চিত হয়েছি, কিছু মানুষের একগুয়েমির কারণে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা খুব বড় অন্যায় করা হচ্ছে।

ডাক্তারি বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ– যারা চিকিৎসা করবেন তাদের চিকিৎসা করতে দেওয়ার আগে বিএমডিসি থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিতে হয়। এই মুহূর্তে বিএমডিসি থেকে এর অনুমতি দেওয়া হয় পাস করা ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টদের। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ডেন্টিস্টদের এই অনুমতি পেতে দীর্ঘদিন চেষ্টা করতে হয়েছিল। একসময় ডাক্তারদের সংগঠন কিছুতেই ডেন্টিস্টদের ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাইছিল না। অনেক কষ্ট করে ডেন্টিস্টরা শেষ পর্যন্ত ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টদের মতো অনেক ধরনের চিকিৎসক হচ্ছেন ফিজিওথেরাপি। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যখন দেখা গেল এ দেশে অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধাকে সুস্থ করে তোলার জন্য অনেক ফিজিওথেরাপিস্ট দরকার, অথচ দেশে ফিজিওথেরাপিস্ট নেই, তখন আমাদের দেশে এ বিভাগটি খুলে এই বিশেষ ধরনের চিকিৎসক তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি এবং বিভাগটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহু বছর পর খুব সংগত কারণেই আবার এ দেশে ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের চার বছরের একটা সুন্দর সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, তারপর এক বছরের ইন্টার্নি করে তাদের দক্ষ একজন ফিজিওথেরাপিস্টে পরিণত করার

BanglaBook.org

প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে যদি একটি দেশেও ফিজিওথেরাপিস্ট দরকার হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ, কারণ এ দেশে যত দুর্ঘটনা হয়ে যত মানুষ পঙ্গু হয়, সারা পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। যারা মারা যায় তারা এক অর্থে বেঁচে যায়; আহত ও পঙ্গুদের সুস্থ এবং সচল করার জন্য দরকার অসংখ্য ফিজিওথেরাপিস্ট। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, একসময় ডেন্টিস্টদের যেভাবে ডাক্তারদের সংগঠন দূরে ঠেলে রেখেছিল, ঠিক একইভাবে এখন এই ফিজিওথেরাপিস্টদের দূরে সরিয়ে রাখছে। বিএমডিসি তাদের স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় এবং এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কোনো উপায় না দেখে তাদের জন্য আলাদা কোনো একটা কাউন্সিল খুলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন করে যাচ্ছে। যে দেশে গ্রেনেড হমলা করে দুই ডজন মানুষকে খুন করে ফেললেও কিছু হয় না, সে দেশে একটা ডিগ্রির স্বীকৃতি নিয়ে কে মাথা ঘামাবে? যখন তার জন্য আবেদন জানাচ্ছে কিছু ছাত্রছাত্রী।

এই ছাত্রছাত্রীরা জানত না তাদের কপালে অনেক বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। তারা হঠাৎ করে খবর পেল, তাদের সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি এই প্রয়োজনীয় ডিগ্রিটির সিলেবাসটিকে কাটছাঁট করে তিন বছরে নামিয়ে এনেছে। ইন্টার্নির বদলে তারা ফিল্ড ওয়ার্ক করে খাঁটি চিকিৎসকের বদলে এখন থেকে তারা একজন চিকিৎসকের সহযোগীর দায়িত্ব পালন করবে। সারা জীবনই দেখে এসেছি একটা কিছুকে ভালো করার চেষ্টা করা হয়– পড়ালেখা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সেটা আরও বেশি সত্য। এই প্রথম দেখতে পাচ্ছি ভালো একটা শিক্ষা কার্যক্রমকে খাবাপ করে ফেলা হলো। সারা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এ রকম উদাহরণ আর একটিও নেই। আমি চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু জানি না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার প্রক্রিয়াটা মোটামুটি জানি। আমি খুব জোর গলায় বলতে পারি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে সিলেবাসটি পাস করে রাখা হয়েছে, সেটাকে আরও উন্নত করা যায় কিন্তু কোনোভাবেই সেটাকে নষ্ট করা যায় না। যারা এটি করেছেন তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে– কে তাদের সে অধিকার দিয়েছে?

আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, শিক্ষাব্যবস্থাকে পিছিয়ে নেওয়ার এই পুরো প্রক্রিয়াটি করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টির ডিন মহোদয়ের প্রচেষ্টায়। তিনি ঘটনাক্রমে বিএমডিসির সভাপতি। এই সরকার আসার পর এই

BanglaBook.org

ভদ্রলোক যে প্রক্রিয়ায় চোখের পলকে হাজার হাজার ছাত্রের ভাগ্য ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছেন সেটা অত্যন্ত চমকপ্রদ। এ দেশের সাংবাদিকেরা সেটি আমাদের জানাবেন, আমি সেটাও আশা করে থাকি।

এ দেশের জন্য অসংখ্য ফিজিওথেরাপিস্ট দরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি করার যে মূল পরিকল্পনা করেছিল, দেশের স্বার্থে সে পরিকল্পনাটি আবার ফিরিয়ে দিতে হবে এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে, সেটি ভয়ঙ্কর একটি সিদ্ধান্ত, ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ অত্যন্ত যুক্তিসংগত। আমি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এ দেশের যথাযথ চিকিৎসা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার, ডেন্টিস্ট ও ফিজিওথেরাপিস্ট চাই। কোনো একজন মানুষ বা কোনো একটা গোষ্ঠী তাদের নিজেদের অর্থের জোগান বা ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যা ইচ্ছে তা-ই করে বসে থাকবেন, সেটি হতে পারে না। (শুনেছি এ দেশে বিএমডিসি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সংগঠন। এ লেখাটি লেখার কারণে হয়তো এখন অসুখ হলে আমাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হবে।)

৪

কিছুদিন আগে প্রথম আলোয় আমার একটা ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের বিষয়বস্তু ছিল মৌলবাদীদের হুমকি, জীবনের টার্গেট– এ রকম গুরুতর বিষয়। মুখে যে হালকা কথাটি খুব সহজে বলা যায়, ছাপা হলে সেটাকেই যে মোটামুটি ভয়ঙ্কর দেখায়, এবার আমার সে অভিজ্ঞতাটি হয়েছে! ইন্টারভিউ ছাপা হওয়ার পর থেকে আমার কাছে চিঠিপত্র, ই-মেইল, এসএমএসের যে ঢল নেমেছে সেটাকে থামানোর কোনো উপায় নেই। সবার বক্তব্য এক, কেন আমি আমার জীবনের টার্গেট করেছি মাত্র ৫০ বছর? ব্যাপারটি আরও গুরুতরভাবে মোড় নেওয়ার উপক্রম হয়েছে। কয়েক বছর আগে টেলিভিশনের জন্য আমি লিরিক নামে একটি নাটক লিখেছিলাম। নাটকের মূল চরিত্র মৃত্যু এবং সমাধি বিষয়ে একটি সিরিয়াস কবিতা লিখেছিল। কীভাবে কীভাবে একটা ব্যান্ডসংগীতের দল সেটাকে গান বানিয়ে নেচে-কুদে প্রচার করে দেয়, সেটা নিয়ে নাটকটিতে কৌতুক করা হয়েছিল। সেই গানের কথাগুলো আমার লেখা 'কবিতা' হিসেবে (আমি জীবনে কবিতা লিখিনি।) ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি শুধু

BanglaBook.org

আমার মৃত্যু পরিকল্পনাতেই সন্তুষ্ট নই, নিজের সমাধিটুকুও ডিজাইন করে ফেলেছি– এই অভিযোগে নতুন করে চিঠিপত্র এবং ই-মেইল আসতে শুরু করেছে! সব মিলিয়ে আমি খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আছি।

তবে এ ঘটনাটি না ঘটলে এ দেশের শিশু-কিশোর এমনকি বড় মানুষজনও যে আমাকে কত ভালোবাসেন, সেটা আমি কোনোদিন জানতে পারতাম না। অসংখ্য শিশু-কিশোর চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছে, তারা তাদের জীবন থেকে বছরগুলো আমাকে দিয়ে দিতে চায়। সেই চিঠিগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ আর কে আছে যে এ দেশের নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মুখ থেকে ভালোবাসার এত সুন্দর কথা শুনতে পারে?

সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এ দেশের শিশু-কিশোরদের ভালোবাসাটুকু ফিরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ এ জীবনে আমাকে করে দেবেন, আমি শুধু সেটাই তার কাছে চাই।

আর স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-মৌলবাদী গোষ্ঠী? একাত্তরে একজন মুক্তিযোদ্ধার সামনে কয়েক শ' রাজাকার নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করত। এখন কেন তার ব্যতিক্রম হবে? আমাদের নতুন প্রজন্ম কি সেই নতুন মুক্তিযোদ্ধা নয়?

প্রথম আলো

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

টুকু গাল ফুলিয়ে বলল, 'আমি ঢ্যাপ খাব না। আমি ভাত খাব।' মা টুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আজ খেয়ে নে বাবা। কাল তোকে ভাত দেব।'

টুকু বলল, 'আমি জানি তুমি দেবে না। তুমি রোজ এক কথা বলো।'

মা দীর্ঘশ্বাসটা বুকে চেপে বাইরে তাকালেন, সামনে তাদের বিস্তীর্ণ ধানী জমি এখন পানিতে থৈ থৈ করছে। একসময় এই জমি থেকে কত ধান হতো খেয়ে ফেলেও শেষ করতে পারতেন না– এখন ছেলের মুখে ভাত তুলে দিতে পারেন না। কতদিন তারা ভাত খান না, ঢ্যাপ, শাপলার নাল, শালুক, হেলঞ্চা, কলমি শাক, কুচো চিংড়ি– এসব খেয়ে আছে। সামনের এই জমিতে কি আর কখনো ধান হবে? যে পানি এসেছে সেটা তো বন্যার পানি নয় যে হঠাৎ এসেছে আবার হঠাৎ চলে যাবে। এই পানি জলাবদ্ধতার পানি, এই পানি এখানে থাকতে এসেছে, এক দিন দুই দিন নয়, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ নয়, এক মাস দুই মাসও নয়– বছরের পর বছর।

মা তার পাঁচ বছরের টুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবা আজ তুই কষ্ট করে খেয়ে নে, কাল তোকে ভাত দেব। তোর বাবাকে বলব শহর থেকে চাল আনতে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তাহলে আগে আমার পায়ের দড়িটা খুলে দাও, আমি কি ছাগল যে তুমি আমার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ?'

মা হাসলেন। বললেন, 'দূর বোকা। তুই ছাগল হবি কেন? তুই আমার সোনামাণিক টুকু। কিন্তু তুই যে এত ছটফটে, শুধু যে লাফঝাঁপ দিস কখন পানিতে পড়ে ভেসে যাবি তাই তো তোর পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।'

টুকু অনুনয় করে বলল, 'লাফঝাঁপ দেব না মা, আমি চুপ করে বসে থাকব, আমার পায়ের বাঁধনটা খুলে দাও।'

BanglaBook.org

মা কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়েই টুকুর পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন। বারান্দায় হাঁটু-পানি, সেখানে একটা মাচা বাঁধা হয়েছে, টুকু সেই মাচার ওপর বসে আছে। বাসার ভেতর, বাইরে, উঠানে, মাঠে, রাস্তায়– সব জায়গায় শুধু পানি আর পানি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। এই এলাকার বৃষ্টির সব পানি ঢল হয়ে এখানে নেমে এসেছে। এখানে পানি আসে কিন্তু যায় না। কিছু অবিবেচক মানুষ স্লুইস গেট দিয়ে পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল, পলিমাটি দিয়ে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে গেছে– এখন পানি ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই। এই বিপদটা মানুষ ডেকে এনেছে। মানুষের নিজের হাতে ডেকে আনা এর চেয়ে বড় বিপদ কি কেউ কখনো দেখেছে?

মা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে মাথা ঘুরে তাকালেন, তার বড় মেয়ে শিউলী স্কুল থেকে পানি ভেঙে হেঁটে আসছে। বই-খাতাগুলো মাথার ওপর ধরে রেখেছে যেন ভিজে না-যায়। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুল হলো?'

'হয়েছে মা।'

'তোদের স্কুলের মাস্টারদের নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই, তা না-হলে চারিদিকে সব পানিতে ডুবে আছে তার মাঝে কেউ স্কুল করে?'

মায়ের কথায় আসলে কোনো বিরক্তি নেই, স্কুলের মাথা-খারাপ মাস্টারদের জন্য এক ধরনের ভালোবাসা আছে। এই এলাকার সবাই লেখাপড়ায় খুব ভালো, পরপর দুবার শতভাগ সাক্ষরতার জন্য পুরস্কার পেয়েছে। আশপাশের সব গ্রামের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে থেকে কালো পানিকে পাক খেয়ে যেতে দেখে। শুধু এই গ্রামের স্কুলটা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। সবাই মিলে চালু রেখেছে, পানিতে হেঁটে, কাঠের ডোঙ্গায় তালের ডোঙ্গায় আসে, পানিতে গা ডুবিয়ে বসে ক্লাস করে। কতদিন এভাবে চালিয়ে রাখতে পারবে কে জানে।

শিউলী তার বই-খাতাগুলো ঘরের ভেতরে উঁচু তাকে রাখে, এই বই-খাতাগুলোই সম্বল, এগুলো যদি ভিজে নষ্ট হয়ে যায় তার সব শেষ হয়ে যাবে। বাইরে এসে সে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, বাবা কোথায়?'

'শহরে গেছে, আজকে মিটিং।'

'কার সঙ্গে মিটিং?'

'মন্ত্রীরা আসবে। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার আসবে। ডিসি-ম্যাজিস্ট্রেটরা আসবে, তাই এলাকার সবাই গেছে।'

BanglaBook.org

'কিছু হবে মা?'

মা প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মা জানেন আসলে কিছু হবে না। একজন-দুজন নয়, এক হাজার-দুই হাজার নয়, চার লাখ মানুষ পানির মাঝে আটকা পড়ে আছে- কেউ তাদের দেখতে আসে না। শহরে বসে মিটিং করে চলে যায়। সবাই যখন চাপ দেয় তখন মাঝেমধ্যে কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেয়, সেগুলো ভুলেও কাজে লাগায় না। আস্তে আস্তে সবাই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে- এই সমস্যাটার কথা বলে নানা রকম প্রজেক্ট তৈরি করা হয়, সেই প্রজেক্ট দেখিয়ে টাকা আনা হয়- তারপর সবাই মিলে টাকা লুটেপুটে খায়। যদি এই সমস্যাটা মিটে যায় তাহলে টাকা আসবে কোত্থেকে? আর টাকা যদি না আসে তাহলে লুটেপুটে খাবে কেমন করে। তাই সব মন্ত্রী-মিনিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার-আমলা মিলে সমস্যাটা বাঁচিয়ে রেখেছে- এটাকে দূর করছে না।

শিউলী বলল, 'ফুলি খালার ছেলেটার জ্বর বেড়েছে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়েছে?'

'না, কাঠের ডোঙ্গায় করে আজকে শহরের হাসপাতালে নেবে।' শিউলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'শাহেদের হাতে-পায়ের ঘা আরও বেড়েছে। পেকে পুঁজ হয়ে গেছে।'

মা কিছু বললেন না, দিন-রাত পানিতে ভিজে থেকে তাদের সবারই হাতে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে। এই ঘা কখনো কি কমবে?

শিউলী ভয়ে ভয়ে বলল, 'মা।'

'কী?'

'আমার ফরম ফিলাপের টাকা জোগাড় হয়েছে?'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মেয়েটা পড়ালেখায় ভালো, ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল, এসএসসিতে নির্ঘাত জিপিএ ফাইভ পাবে। ফরম ফিলাপের সময় আসছে একসঙ্গে অনেক টাকা লাগবে, কোথা থেকে আসবে এই টাকা? পুরো এলাকায় কারও কোনো রোজগার নেই, মাইলের পর মাইল যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, আবাদ নেই, শস্য নেই, খাবার নেই। যার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে ফেলেছে- এখন বিক্রি করার মতোও কিছু নেই। এর মধ্যে কি কেউ লেখাপড়া করার কথা ভাবে? যারা একেবারে কুকুর-বেড়ালের মতো বেঁচে আছে, তারা কি লেখাপড়ার কথা ভাবতে পারে?

BanglaBook.org

শিউলী মায়ের মুখ দেখে আর কিছু বলার সাহস পায় না। সে যদি ফরম ফিলাপ না-করতে পারে তাহলে কেমন করে পরীক্ষা দেবে? কত আশা করে আছে সে স্কুল-কলেজ শেষ করে মেডিকেলে পড়বে। পাস করে ডাক্তার হয়ে সে সাদা একটা অ্যাপ্রন পরে তার গ্রামে ফিরে আসবে, ছোট বাচ্চাগুলোর বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে বলবে, 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও।' তারপর কাগজে খস খস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেবে। এখন এই কালো পানি এসে তার সব স্বপ্নকে মিথ্যে করে দেবে? তাহলে সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে?

মা ঘরের ভেতর থেকে কিছু ভেজা কাপড় এনে চিপে নেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'শিউলী- মা, যা দেখি এক কলসি পানি নিয়ে আয়। স্কুলের টিউবওয়েলটা নাকি উঁচু করেছে।'

'যাচ্ছি মা।' শিউলী কলসিটা পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে ছপছপ করে হেঁটে যেতে থাকে। তার নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না, মনে হয় একটা জলজ প্রাণী। মানুষ হলে কি আর কেউ দিন-রাত এ রকম পানিতে বেঁচে থাকতে পারে?

শিউলী পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখে টুকু মাচাতে পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে আছে। শিউলী পানির কলসিটা ঘরের ভেতর চৌকির ওপরে রেখে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'টুকু, মা কোথায়?'

'মিনু খালার বাড়ি গেছে।'

'কেন?'

'মিনু খালার বাচ্চা হবে তো, তাই মাকে ডেকে নিয়েছে।' টুকু গম্ভীর গলায় বলল, 'ব্যথা উঠেছে।'

শিউলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে, মিনু খালার বাড়ি খালের ওপারে। এখন তো খাল-বিল-পুকুর কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না। পানিতে ডুবে সবই একাকার হয়ে গেছে। কয়দিন থেকে সবাই বলাবলি করছিল পূর্ণিমার রাতে নাকি মিনু খালার বাচ্চা হবে। তাকে তখন কখন কোথায় কীভাবে নেবে কিছুই বুঝতে পারছিল না, এখন দুই দিন আগেই মিনু খালার ব্যথা উঠেছে এখন কী করবে? কোথায় নেবে? কেমন করে নেবে। শিউলী নিজের ভেতর কেমন জানি এক ধরনের অশান্তি অনুভব করতে থাকে।

টুকু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা শিউলী আপু, পানি যদি আরও বেশি হয় তখন কী হবে?'

BanglaBook.org

'আর বেশি হবে না।'

'তুমি কেমন করে জান? যদি বাসার ছাদ পর্যন্ত পানি উঠে যায় তাহলে কি আমরা সবাই মরে যাব?'

'ধুর গাধা। মরবি কেন? কেউ মরবে না। দেশের সব মানুষ আমাদের কথা জেনে গেছে না? তারা সবাই আমাদের সাহায্য করতে চলে আসবে না?'

টুকু ঠোঁট উল্টিয়ে বলর, 'কচু আসবে।'

মা যখন ফিরে এসেছেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন মুখে শিউলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাবা কি এসেছে?'

'না, মা।'

'দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো।'

শিউলী ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা? দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো কেন?'

'শহরের লোকজন নাকি মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ঘেরাও দিচ্ছে। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সঙ্গে পুলিশ থাকে, বিডিআর থাকে, তারা তো কথায় কথায় গুলি করে দেয়।'

শিউলী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'গুলি করেছে নাকি?'

'না। এখনো করেনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ? যে অবস্থা চলছে আমার তো মনে হয় এক-দুই দিনের মাঝেই গুলিগোলা হবে।'

শিউলী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'মা, মিনু খালার কী খবর?'

হঠাৎ মায়ের মুখটা হাসিতে ভরে গেল, হাসতে হাসতে বললেন, 'কী ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে, বিশ্বাস করবি না। একেবারে ফুলের মতো।'

'কোনো অসুবিধা হয় নাই মা?'

'হয় নাই আবার! ডেলিভারি করার মতো একটা শুকনো জায়গা নাই। শেষে কোনো উপায় না-দেখে মিনুকে তুলেছি একটা কাঠের ডোঙ্গায়। আমরা কয়জন ডোঙ্গাটাকে শক্ত করে ধরেছি আর তখন সুহাসিনী দাই ডেলিভারি করাল ডোঙ্গার ওপর জন্ম তো তাই সবাই হাসাহাসি করে বলছে, এই মেয়ের নাম দেওয়া হবে ডোঙ্গা বিবি!'

মায়ের কথা শুনে টুকু হি হি করে হাসতে থাকে।

বাবা এলেন একটু পরেই। চেখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। মাচায় বসে শার্ট খুলে

BanglaBook.org

নিজেকে বাতাস করছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে খেতে দেব? ঢ্যাপের খই আছে, সাথে হেলঞ্চের সেদ্ধ।'

বাবা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'নাহ! দুপুরবেলা শহরে এক কাপ চা খেয়েছিলাম, খিদে মরে গেছে।'

'শহরে মিটিংয়ের কী হলো?'

'কিছু হয় নাই। সবাই চাপ দিয়েছে এলাকাটাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করতে। রাজি হয় না।'

'কেন রাজি হয় না?'

'জানি না। শুনেছি'– বাবা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

'কী শুনেছ?'

'মন্ত্রী সাহেব নাকি বলেছেন, মালাউনের বাচ্চাদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোনো লাভ নেই।'

টুকু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মালাউনের বাচ্চা মানে কী বাবা?'

বাবা হাত নেড়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা। ওসব কথা শুনতে হয় না।' টুকু তাই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল না, আদুর গলায় বলল, বাবা আমি কিন্তু কাল ভাত খাব।'

বাবা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'ঠিক আছে।'

'আমি আর ঢ্যাপ খাব না। শাপলার নাল খাব না। শালুক খাব না। গরম ভাত খাব ডিম ভাজা দিয়ে।'

'ঠিক আছে বাবা।'

'আর আমি এই পানির ওপরে মাচায় বসে থাকব না। আমাকে তুমি শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে।'

'নিয়ে যাব।'

'শুকনো জায়গায় গিয়ে আমি লাফাব। আর দৌড়াব। তখন কি মজা হবে না বাবা?'

'হ্যাঁ, অনেক মজা হবে।'

টুকু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি কবে শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে বাবা?'

'এই তো একটু সময় পেলেই নিয়ে যাব।'

BanglaBook.org

টুকু ঠোঁট উল্টে বলল, 'তুমি কোনোদিন সময় পাবে না।'

বাবা বেশিক্ষণ বসলেন না, একটু পরেই আবার বের হয়ে গেলেন, গ্রামের লোকজন সন্ধ্যাবেলা আবার বসবে, এরপর কী করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। কম বয়সী কিছু মাথা-গরম ছেলে আছে, তারা পারলে এখনই রাস্তাঘাট, ট্রেন সবকিছু অবরোধ করে জ্বালাও-পোড়াও শুরু করতে চায়। যে রকম অবস্থা তাদের বেশি দিন শান্ত রাখা যাবে না। বছরের পর বছর মানুষ পানিতে ডুবে থাকবে, কেউ তাদের জন্য কিছু করবে না– সেটা তো সহ্য করা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা টুকু একা একা মাচার ওপর বসেছিল তার হাতে লাল রঙের একা প্লাস্টিকের বল। বাবা যখন তাকে শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে তখন সে এই বলটা নিয়ে যাবে। শুকনো মাটির ওপর সে বলটা দিয়ে খেলবে। কেমন করে খেলবে সে সেটা একটু পরীক্ষা করে দেখল, ওপরে ছুড়ে দিয়ে ধরে ফেলল। হঠাৎ কী হলো, বলটা তার হাত থেকে ফসকে গেল, টুকু কাত হয়ে বলটাকে ধরতে গিয়ে মাচা থেকে নিচে পড়ে যায়। কোনোমতে মাচাটাকে সে ধরতে চেষ্টা করল, পারল না– চোখের পলকে সে পানিতে ডুবে গেল। কোনোমতে একবার সে মাথা বের করে চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু কালো পানি তার মুখ দিয়ে ঢুকে গেল, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে সে আবার পানির নিচে তলিয়ে গেল আর বের হলো না।

শহর থেকে একজন সাংবাদিক এসেছে, তাকে ঘিরে অনেক লোকজন বসেছে। সাংবাদিকের বয়স বেশি নয়, চেহারায় একটা আন্তরিক ভাব। যে যেটাই বলছে সে তার ছোট নোট বইটাতে সেটা খসখস করে লিখে ফেলছে। বাবা কী একটা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন একজন লোক তার হাত খামচে ধরল। বাবা মাথা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখেন মাস্টার সাহেব। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মাস্টার সাহেব?'

'তুমি এক্ষুণি বাড়ি যাও।'

'কেন মাস্টার সাহেব?'

'তোমার ছেলে টুকু...

বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কী হয়েছে টুকুর?'

মাস্টার সাহেব ফিস ফিস করে বললেন, 'মাচা থেকে পড়ে পানিতে ডুবে...'

BanglaBook.org

বাবার মনে হলো তার মাথার মধ্যে বুঝি একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো। পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনোমতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ধরে নিজেকে সামলে নিলেন। তার মনে হতে লাগল, চোখের সামনে থেকে পুরো জগৎ-সংসার ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যচ্ছে। মনে হতে থাকে তার সামনে কোথাও কিছু নেই। শুধু বিশাল এক শূন্যতা, যে-শূন্যতার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই।

কাঠের একটা ডোঙ্গায় টুকু নিথর হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে একটা কুপিবাতি জ্বলছে। আগুনের শিখাটা নড়ছে, তার আবছা আলোতে টুকুর মুখের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হয় সে বুঝি খুব শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে।

মাওলানা সাহেব বললেন, 'আমার বাড়িতে একটা পরিস্কার চাদর আছে। কেউ সেটা নিয়ে আসো, সেটা দিয়ে কাফন দেওয়া যাবে।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'কিন্তু মাটি দেব কোথায়? মাটি তো নাই।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'অন্য দশজনের বেলায় যেটা করেছি সেটাই করব। নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেব। মাসুম বাচ্চা আল্লাহ নিজের কাছে নিয়ে নেবে।'

কেউ কোনো কথা বলল না। কাঠের ডোঙ্গাটা ঘিরে গ্রামের মানুষেরা কোমর পানিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার একটা শব্দ ভেসে আসে, অন্ধকার রাতে সেই কান্নার শব্দ বুকের ভেতর এসে আঘাত করে।

মাওলানা সাহেব বললেন, 'আল্লাহ আমাদের মাপ করে দেবেন। মসজিদে পানি, নামাজ পড়তে পারি না। মন্দিরেও পানি হিন্দুরাও পূজা করতে পারে না। এই সময়টা হচ্ছে আজাবের সময়। এই সময়ে কোনো নিয়ম-কানুন নাই।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'তাহলে পানিতেই ভাসিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ।'

বাবা অন্ধকারে এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এবার হঠাৎ এগিয়ে এসে কাঠের ডোঙ্গায় ঝুঁকে টুকুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'না। আমি আমার এই বুকের ধনকে পানিতে ভাসিয়ে দেব না। সে শুকনোর মাঝে খেলতে চেয়েছিল, আমি তারে শুকনোর মাঝে নিতে পারি নাই। আমি তারে শুকনোর মাঝে মাটি দিব।'

BanglaBook.org

মাস্টার সাহেব বাবার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি শুকনো মাটি কোথায় পাবে? যেদিকে তাকাও, মাইলের পর মাইল খালি পানি।'

বাবা টুকুর শীতল দেহটি তুলে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরলেন, তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি শুকনো মাটি খুঁজে বের করব। আমার টুকুর জন্য আমি মাটি খুঁজে বের করব।'

গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখল একজন বাবা তার মৃত সন্তানকে বুকে চেপে ছপ ছপ করে পানিতে হেঁটে যাচ্ছে। সে এক টুকরো শুকনো মাটি খুঁজে বের করবেই। বেঁচে থাকতে যে শিশুটি শুকনো মাটি পায়নি, মৃত্যুর পর তাকে সে মাটিটুকু দেবেই।

এটি কাল্পনিক গল্প নয়, এটি সত্য গল্প। এখানে যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হয়েছে যশোরের ভবদহে গিয়ে আমি সেগুলো নিজের চোখে দেখেছি, না-হয় নিজের কানে শুনেছি। একেবারে নিজের চোখে না-দেখলে কিংবা নিজের কানে না-শুনলে আমি সেটা বিশ্বাস করতাম না। চরিত্রগুলোর নাম বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাটুকু কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু মূল ঘটনাগুলোর সব সত্য। যশোরের ভবদহ এলাকার প্রায় চার লাখ পানিবন্দী মানুষের এটা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন।

তাদের পাশে কেউ নেই। সরকার নেই, আমলা নেই, ওয়াপদা নেই, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক– কেউ নেই। যদি থাকত তাহলে এই মানুষগুলো বছরের পর বছর এই রকম একটা জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো না। খবরের কাগজে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলা হয় না। যখন বলা হয় তখন সেটি হয় এত দায়সারা যে সেই খবর কারও চোখে পড়ে না। তাই মানুষের তৈরি এত বড় বিপর্যয়ের কথা এই দেশের মানুষ জানে না। টেলিভিশনের জন্য সেটি খুব দুর্গম এলাকা তাই তারা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে সেখানে যায় না। টেলিভিশন চ্যানেল এখন তারকা খুঁজে বেড়াচ্ছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে তারকাদের ঝলমলে জীবন অনেক চমকপ্রদ। তাই পানিবন্দী দুঃখী চার লাখ মানুষের পাশে কেউ নেই।

কিন্তু তাদের পাশে মানুষকে দাঁড়াতে হবে এই দেশের মানুষকে এখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম আলো

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক আর কয়টা আছে? তাই তার ব্যবসা করে আলফ্রেড নোবেল অনেক টাকা-পয়সা কামাই করেছিলেন। শেষ বয়সে তার মনে হলো যুদ্ধ-বিগ্রহে ডিনামাইট ব্যবাহার করে কত হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তার মৃত্যুর পর পৃথিবীর মানুষ তো তাকে এই ভয়াবহ মানববিধ্বংসী বিস্ফোরকের আবিষ্কারক হিসেবেই মনে রাখবে, কাজটি কি ভালো হলো? এ রকম একটা গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আলফ্রেড নোবেল তার অঢেল সম্পদকে ব্যবহার করে মৃত্যুর আগে নোবেল পুরস্কার নামে একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেলেন। তার ধারণা সঠিক ছিল– এখন নোবেল কথাটা শুনলে কেউ ভুলেও ডিনামাইট, বোমা, মৃত্যু বা হত্যাযজ্ঞের কথা মনে করে না। সবাই এখন নোবেল শব্দটার সঙ্গে যুক্ত করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মননশীল মানুষদের– বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ কিংবা সমাজসংস্কারদের।

সারা পৃথিবী খুঁজে একেবারে হাতেগোনা দুয়েকজনকে এই বিরল সম্মানের পুরস্কারটি দেওয়া হয় বলে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এই পুরস্কার বা এই পুরস্কার পাওয়া মানুষদের ধারে-কাছে আসতে পারে না। তাই ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে আমি যখন আমাদের একজন প্রফেসরকে আবিষ্কার করলাম, যে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি বলে খুব তিরিক্ষি মেজাজে থাকতেন– আমি এক ধরনের কৌতুক অনুভব করেছিলাম! প্রফেসরের নাম হান্স ডেহমলেট, তাঁর ছিল মাথাভরা টাক এবং বিশাল জুলফি। পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ থেকে এসেছিলেন বলে ইংরেজি উচ্চারণ ছিল খুব মজার। তাঁর একটা কোর্স করার পর তিনি আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রতি অক্টোবরে যে মানুষের মেজাজ গরম হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমার সাহস নেই– আমি সবিনয়ে তাঁর

BanglaBook.org

আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মজার ব্যাপার হলো, তার কয়েক বছর পর সত্যি সত্যি হান্স ডেহমলেট নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্রফেসর হান্স ডেহমলেটকে দেখে আমি অক্টোবর মাসে মেজাজ গরম করার বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম। বছর পনেরো আগে আমি যখন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের কথাটা জানতে পেরেছিলাম তখন থেকেই আমি মনে মনে আশা করেছিলাম যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবেন। আমি আমার কোনো একটি বইয়ে এই বিষয়টি লিখেছিলাম এবং সেই বই পড়ে অনেক মানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাসে মেজাজ গরম করতে লাগল। গত পরশু দুপুরে আমার এক যুগ থেকে বেশি সময়ের অপেক্ষা শেষ হয়েছে! আমি বলতে গেলে টেলিভিশন দেখিই না, অথচ ঠিক যখন নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাটি দেওয়া হচ্ছে আমি তখন ঘটনাক্রমে টেলিভিশনের সামনে। এ রকম একটি ঘোষণা কেমন করে দেয় সেটি নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে আমি বহু দিন পরে একেবারে বাচ্চাদের মতো চিৎকার করে ছুটে বেরিয়েছি! এত আনন্দ কোথায় রাখব, কাকে দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না!

পশ্চিমা কালচারে ধরে নেওয়া হয় ১৩ তারিখটা খুব অশুভ আর সেই তারিখটা যদি হয় শুক্রবারে তাহলে তো কথাই নেই। 'ফ্রাইডে দ্য থার্টিনথ' নামে সেই দেশে ভয়ঙ্কর সব ভয়ের ছবি তৈরি হয়– সেই অশুভ ভয়ের দিনটি আমাদের জন্য কত আনন্দ নিয়ে এসেছে কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পারবে?

২

আমরা বাঙালিরা হইচই করতে খুব পছন্দ করি। ছোটখাটো ঘটনাতেই আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি, রঙ খেলায় মেতে উঠি। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো এত বড় ঘটনার পর আমরা যে আনন্দের আতিশয্যে কী করব বুঝতে পারব না সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। গত কয়েক দিন পত্রপত্রিকা ইউনূসে ইউনূসময়। শুধু যে খবর, ফিচার, আলোনচা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নিয়ে তা নয় পৃষ্ঠাজোড়া বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে। টেলিভিশনে তাঁর ওপর আলোচনা হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁকে নিয়ে গুণীজনদের আলোচনা এবং প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। এ রকম একটা সময়ে আমি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে

BanglaBook.org

একটিও নতুন কথা বলতে পারব বলে মনে হয় না। এতক্ষণে তিনি কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করেন কিংবা তার ফতুয়াটা কোন দোকান থেকে কেনেন– সেটাও নিশ্চয়ই দেশের সবাই জেনে গেছে!

আমি তাঁর একজন খুব বড় ভক্ত। বাংলাদেশের যেসব মানুষ বিদেশে থাকে তারা সবাই জানেন সেটি কত কষ্টের– বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানে কখনো একটিও ভালো কথা ছাপা হয় না। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দেশে চলে এসে আমি সেই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু এখনো যারা বিদেশে রয়ে গেছেন তাদের সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। গত এক যুগে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে, আমাদের দেশে জঙ্গিবাহিনীর জন্ম হয়েছে, হাওয়া ভবন তৈরি হয়েছে, র‍্যাব দিয়ে ক্রসফায়ার শুরু হয়েছে, গ্রেনেড হামলার প্রচলন হয়েছে। এখন যারা বিদেশে থাকেন তাদের অবস্থা চিন্তা করে আমি তাদের জন্য করুণা অনুভব করি। এক যুগ আগে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম আমাদের দেশ নিয়ে যেটুকু ভালো কিছু বলা হতো সেটা ছিল প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আর তার গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে। আমার ধারণা, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিদেশের মাটিতে আমাদের দেশকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। '৯২ সালে একবার দেশে এসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এ রকম ঝকঝকে পরিষ্কার চিন্তার মানুষটিকে দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই এবং এখনো মুগ্ধ হয়ে আছি। তাঁর যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে দেশের জন্য তীব্র মমত্ববোধ। মনে আছে, কয়েক বছর আগে একবার আমাদের ধারণা হলো দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রবাসী বাঙালিদের এর মধ্যে সম্পৃক্ত করা দরকার। কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় আমেরিকা গিয়ে প্রবাসী পেশাজীবীদের সরাসরি সেটা বলতে পারলে। কথাটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় যদি সেটা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মুখ দিয়ে বলানো যায়। তাই আমরা গিয়ে একদিন প্রফেসর ইউনূসকে অনুরোধ করলাম আমেরিকা যেতে তিনি এককথায় রাজি হয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমাদের যদি মনে হয় আমাকে নিয়ে গেলে তোমাদের কাজ হবে, আমি তাহলে অবশ্যই যাব!' আমরা এখন সবাই জানি সারা পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কিংবা কথা বলতে সুযোগ পান না। এ রকম একটা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় অ্যাটলান্টিক

BanglaBook.org

সিটিতে গিয়ে সেই কনভেনশনে যোগ দিলেন, শুধু যে যোগ দিলেন তা নয় সেখানে সময় দিলেন, সবার সঙ্গে কথা বললেন। আমি নিশ্চিত আমার যে রকম এই একটা অভিজ্ঞতা আছে, এ দেশের আরও অসংখ্য মানুষের ঠিক সে রকম অসংখ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে সময় কাটাতে হয় এবং সে কারণে অবধারিতভাবে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকেরও সমালোচনা শুনতে হয়। সেসব সমালোচনা সাধারণত আমি এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি– তার কারণ একটিই; প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের যে বিশ্বাসটুকু এই ব্যাংকের জন্ম দিয়েছে সেটি যদি সত্যি না হতো তাহলে কোনোভাবেই গ্রামীণ ব্যাংক এভাবে বিকশিত হতো না! এই দেশের একেবারে হতদরিদ্র মানুষেরা এটি গ্রহণ করেছে, তারা তো কোনো তত্ত্ব কথা পড়ে আসেনি; তারা এসেছে নিজের জীবনের একটু পরিবর্তন আনতে। যদি সেই পরিবর্তনটুকু তারা না আনতে পারে তাহলে কেন তারা এই ব্যাংকটিকে এভাবে বিকশিত হতে দিয়েছে? তারা যদি খুশি থাকে তাহলে আমি কেন বেজার থাকব?

সত্যি কথা বলতে কী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সারা পৃথিবীকে একটা জিনিস শিখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে মানুষকে বিশ্বাস করা। একজন মানুষের বুকের ভেতর মনুষ্যত্বের সলতেটুকু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বলতে থাকে সেটাকে স্পর্শ করলে সেটা যে আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করে– এই সত্যটুকু তাঁর মতো করে পৃথিবীকে কি আর কেউ দেখিয়েছেন?

৩

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণে আমার আনন্দের সম্পূর্ণ একটা ভিন্নমাত্রা রয়েছে। এই দেশের অসংখ্য শিশু-কিশোর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলছে, 'স্যার এবারে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানেও নোবেল পুরস্কার পেতে হবে! রসায়নে পেতে হবে।' বর্তমান বিজ্ঞান কোন পর্যায়ে গেছে– সে সম্পর্কে এই শিশু-কিশোরদের কোনো ধারণা নেই, বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কারা পাচ্ছেন সেটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে; সেটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একেবারে আধুনিকতম ল্যাবরেটরিগুলোর আশপাশে। তত্ত্বীয় আর ব্যবহারিক জ্ঞান এখন হাতে হাত ধরে এগিয়ে যায়, একা অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এত খুঁটিনাটি বাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা সজোরে

BanglaBook.org

ঘোষণা করে বসে থাকে এখন আমাদের পদার্থবিজ্ঞানে কিংবা রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেতে হবে! এই বিশাল আত্মবিশ্বাস আর অনুপ্রেরণাটুকু আমরা কি কখনো আমাদের সন্তানদের দিতে পেরেছি? এই দেশের ছেলেমেয়েরা নিজের চোখে দেখেছে, এই দেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ এই দেশের মাটিতে কাজ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানটুকু অর্জন করেছেন, তাহলে তারা কেন এ রকম অসাধ্য সাধন করতে পারবে না?

গত কয়েক দিন যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে হাত ধরে তাকে বলেছি, 'অভিনন্দন'; সে আমার হাত ধরে বলেছে, 'অভিনন্দন'। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এই বিরল সম্মানটুকু আমাদের জন্য এনেছেন আর কী অনায়াসে সেটা আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে ফেরেছি! মনে হচ্ছে তিনি একা নন, আমরাও বুঝি সেই সম্মানটুকু অর্জন করে ফেলেছি, আমাদের মাথা বুঝি আকাশ-ছোঁয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরে এত আত্মবিশ্বাসের জন্ম কি কেউ আগে দিয়েছিল?

৪

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর নোবেল পুরস্কারটি আধা-আধি ভাগ করে নিয়েছেন গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে। এই গ্রামীণ ব্যাংকটি বিস্ময়কর একটি ব্যাংক, কারণ এর ৯৫ শতাংশই হচ্ছেন নারী। আমাদের দেশের দুস্থ নারীরা অনেকে হয়তো জানেনই না যে তারাও নোবেল পুরস্কার পেয়ে বসে আছেন! আমার মনে হয় শুধু বাংলাদেশের নারীরা নয়, সারা পৃথিবীর মহিলাদের জন্য এটি বিশাল একটি বিজয়।

৫

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনের নানা সাফল্য, নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এখন চারদিকে আলোচনা হচ্ছে। যারা সেগুলো পড়েছে তারা সবাই জানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাঁকে তার পেছনে লেগে থাকতে হয়েছে, নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে, অসংখ্য উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের বইয়ের পাঠ্যসূচিতে তাঁর জীবনীটুকু রাখা উচিত এই একটি কারণে, কোনোকিছু অর্জন করতে হলে একজনকে কীভাবে তার জন্য কষ্ট করতে হয় সেটা বোঝার জন্য।

স্কুলের বইয়ে তাঁর জীবনীটুকু তুলে ধরলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও একটা বিষয় থাকবে, সেটা হচ্ছে, একাত্তর সালে তাঁর অসাধারণ একটি ভূমিকা। গ্রামীণ

BanglaBook.org

ব্যাংক নিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্যের কাহিনীর কারণে অনেক সময়েই তাঁর সেই ভূমিকাটুকুর কথা অনেকেই সেভাবে জানেন না। আমরা এখন জানি 'দোর্দণ্ড প্রতাপ' পাকিস্তান সেনাবাহিনী নয় মাসের ভেতর তাদের লেজ গুটিয়ে এই দেশে আত্মসমর্পণ করেছিল। একাত্তর সালে যখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রম শুরু হয় তখন কিন্তু কেউ সেটা জানত না। একজন যখন মুক্তি সংগ্রমে যোগ দিয়েছিলেন তারা কিন্তু ভবিষ্যতের দীর্ঘ এক অনিশ্চিত জীবনে নিজের পুরো জীবনটুকু উৎসর্গ করেছিলেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তখন আমেরিকায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কাজ করেছিলেন। যারা তখন তাঁর পাশাপাশি কাজ করেছেন আমি তাদের কাছে গল্প শুনেছি, সেগুলো অবিশ্বাস্য এক ধরনের গল্প। দেশের জন্য ভালোবাসায় একজন কীভাবে তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারেন সেটি হচ্ছে তার অভূতপূর্ব একটি ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেরি করেননি, সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এসেছেন। যে বিশাল আত্মত্যাগ করে এই দেশের জন্ম হয়েছে তিনি সেটা কখনো ভুলেননি, তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ তিনি এই দেশের জন্য ঢেলে দিয়েছেন। এখন তিনি আর শুধু আমাদের নন, তিনি এখন সারা পৃথিবীর, কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের অধিকারটুকু সবার আগে।

এই দেশকে নিয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সব সময় স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর সেই স্বপ্ন এই দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে, তারাও সেই স্বপ্ন দেখেছে। দেশের দুঃসময়ে তিনি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি, কিছু একটা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। মুখে বড় বড় কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু কিছু একটা করা সহজ নয় তারপরও সেটা করেই দেখাতে হয়, আমরা সেটা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে শিখেছি।

আমদের খুব সৌভাগ্য, আমাদের সামনে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আছেন। নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখানোর জন্য সামনে কাউকে থাকতে হয় আর তাদের সামনে যিনি আছেন তিনি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সফল মানুষদের একজন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সেই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এই দেশের জন্য আর এই দেশের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা।

আমাদের খুব সৌভাগ্য, আমাদের নতুন প্রজন্ম দেশকে ভালোবাসার প্রথম পাঠটি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন মানুষের কাছ থেকেই নিতে পারবে।

প্রথম আলো

২০ অক্টোবর, ২০০৬

BanglaBook.org

একজন অসুখী রাষ্ট্রপতি

আমার কেন জানি মনে হয় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে অসুখী মানুষ রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাকে যারা দেখেছেন, সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। সেই অনুষ্ঠানটির মতো প্রাণহীন নিরানন্দ অনুষ্ঠান এর আগে কেউ কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি শুধু অসুখী নন, তিনি ক্লান্ত, ভীত এবং আতঙ্কিত। রাষ্ট্রপতির আশাপাশে মিলিটারি পোশাক পরা এত লোক থাকে আমি জানতাম না, তাকে এত অবলীলায় টানাহ্যাঁচড়া করা যায় সেটাও আমি জানতাম না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি যখন স্বাক্ষর করছিলেন তাকে দেখে একবারও মনে হয়নি তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে কাজটি করছেন। তার এ দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা ছিল না, অধ্যাপক বি. চৌধুরীকে অসম্মান করে সরিয়ে দেওয়ার পর প্রায় হঠাৎ করে তার ওপর এই দায়িত্বটি এসে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে যে খানিকটা অহঙ্কার বোধ করিনি তা নয়, তবে এখন আমার ভেতরে সেই অহঙ্কারের কিছু অবশিষ্ট নেই। যারা কূটকৌশলে অভ্যস্ত তারা হয়তো ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন, আমি এবং আমার মতো দেশের লাখ-কোটি মানুষ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। যখন ঘোষণা করা হলো রাত আটটার সময় প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন সব সমস্যা মিটে গেছে, সেই আনন্দে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কাছে টেলিফোন এসেছে। যখন দেখা গেছে যে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নিজে সেই দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন, তখন আমার কাছে টেলিফোন করে ছেলেমেয়েরা হাউমাউ করে কান্নাকাটি করেছে, বলেছে, 'আপনি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে বলেন, আপনার কথা বিশ্বাস করে আমরা স্বপ্ন দেখি! এখন সেই স্বপ্নের কী হবে?'

সারা দেশের মানুষের সঙ্গে আমিও আতঙ্কে পাথর হয়ে বসেছিলাম। গত

BanglaBook.org

দুদিন থেকে যে সংঘাতের দৃশ্য দেশের মানুষ দেখেছে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন। ১৪ দলের কর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবং ক্রোধ বিস্ফোরণের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণটুকু একটা ষড়যন্ত্রের মতো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ক্রোধোন্মত্ত কর্মীরা হাতের লগি এবং বৈঠা নিয়ে এখন কী করবে? আমরা এখন কী দেখব? মিলিটারি এসে আমাদের এত স্বপ্নের গণতন্ত্রকে টুঁটি চেপে হত্যা করবে?

তখন শেখ হাসিনা হাসিমুখে যেভাবে পুরো বিষয়টি গ্রহণ করলেন তার কোনো তুলনা নেই। পুরো দেশটিকে তিনি যেভাবে একটা ভয়ঙ্কর সংঘাত থেকে রক্ষা করে দিলেন, দেশের সব মানুষ সেটি মনে রাখবে। টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি খোদার কাছে তখন শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করেছি। আমার ধারণা শুধু আমি নই, এই দেশের লাখ-কোটি মানুষ তার জন্য দোয়া করেছে। রাজনীতিবিদেরা মাঠ দখলের কথা বলেন, তারা লাঠিসোটা নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করে মাঠ দখল করতে চান। কিন্তু মানুষের হৃদয়টুকু দখল করা যে মাঠ দখল করা থেকে একশ' গুণ বেশি কার্যকর তারা কি সেটা বুঝবেন না?

সেই ভয়াল রাতটুকু কেটে যাওয়ার পর সবাই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছেন, সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ এখন দেশের মানুষের মুখে মুখে। রাষ্ট্রপতির হাতে সংবিধান রক্ষিত হয়েছে না লঙ্ঘিত হয়েছে সেটা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কোনো জটিলতায় না গিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে। কেন চারদলীয় জোটের নেত্রী খালেদা জিয়া হঠাৎ করে হুমকি ধমকি দিয়ে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছিলেন—বিষয়টা এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। পরদিন বিটিভিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন বোরহান উদ্দিন খান হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা যে আইনসম্মত হয়েছে সেটা বোঝানোর কাজে লেগে গেলেন। খবরের মাঝে একজন মানুষের এত দীর্ঘ ব্যাখ্যা এর অগে কখনো দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও কখনো দেখা যাবে না! তিনি কী বলেছেন তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি কীভাবে বলেছেন এবং কেন বলেছেন। ভদ্রলোক কিছু জিনিস এখনো জানেন না, এই দেশের মানুষ বিটিভিতে প্রচারিত একটা অক্ষর বিশ্বাস করে না, আর সেটি যদি আসে আইনমন্ত্রী কিংবা আইন অনুষদের ডিনদের মুখ দেখে তাহলে তো বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এত দীর্ঘ বক্তব্য কেউ মন দিয়ে শুনেছে বলে মনে

BanglaBook.org

হয় না, তবে বিচারপতি মাহমুদুর আমীন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগটি যে ছিল 'প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে একজন সুশীল নাগরিক খোঁজার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা' সেই কথাটি নিশ্চয় সবার কানে লেগে আছে। মাননীয় ডিন সাহেবের সঙ্গে কোনো দিন দেখা হলে আমি নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞেস করব, তিনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন এই দেশের মানুষ ও রকম অকাট আহাম্মক? কে এম হাসান তো কখনোই অসুস্থ ছিলেন না, অথচ তাকে অসুস্থ বলে ঘোষণাটি কে দিয়েছিল? কেন দিয়েছিল? রাস্তার পাশে দোকানে চা খেতে খেতে একজন সত্যকে অপলাপ করতে পারে, রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে কেন মিথ্যা কথা প্রচার করা হবে? আমি যদি এখন রাষ্ট্রপতির কোনো কার্যকলাপ বিশ্বাস না করি কেউ আমাকে দোষ দিতে পারবে?

ব্যাপারটা তা-ই ঘটেছে, অন্যদের কথা জানি না, আমি ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার নাটকটুকুর মাঝে আর র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মানুষ হত্যা করার প্রচারিত কাহিনীর মাঝে কোনো পার্থক্য দেখিনি। এরিস্টটল এবং টলেমি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং অন্য সব গ্রহ-নক্ষত্র চাঁদ সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের অত্যন্ত জটিল এক ধরনের কক্ষপথ ভেবে বের করতে হয়েছিল– একটা গ্রহ একদিকে যেতে যেতে হঠাৎ করে গতিপথ পরিবর্তন করে উল্টোদিকে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কোপার্নিকাস সত্যটি আবিষ্কার করলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে সব গ্রহ ঘুরছে, সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা। এখানেও তা-ই হতে পারে বিটিভির খবরে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিনের দেওয়া অত্যন্ত জটিল একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা আমরা বিশ্বাস করব নাকি দলীয় রাষ্ট্রপতি দলের জন্য কাজ করছেন এই সহজ-সরল ব্যাখ্যাটি আমরা গ্রহণ করব। সৌরজগৎ সম্পর্কে কোপার্নিকাসের মতবাদ গ্রহণ করতে পৃথিবীর মানুষের কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল, দলীয় রাষ্ট্রপতি দলের জন্য কাজ করছেন এই মতবাদটি এই দেশের মানুষের কাছে কয়েক দিনের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! আমার মনে হয় সেটি হতে শুরু করেছে।

রাজনীতি বিষয়টা আমি ভালো করে বুঝি না, যখন মনে হয় কোনো কিছু বুঝতে শুরু করেছি তখন হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটে যখন আমার সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়; তারপরও আমার মনে হয় একটা বিষয় আমি সবার মতোই বুঝতে পারছি। চারদলীয় জোট যেভাবেই হোক সামনের ইলেকশনে

BanglaBook.org

জেতার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কেউ যদি অবাধ নির্বাচন করতে চায় তাহলে তার জন্য নিরপেক্ষ যেকোনো প্রধান উপদেষ্টা, যেকোনো নির্বাচন কমিশনার বা যেকোনো প্রশাসন একই কথা। কিন্তু যদি দেখা যায় একটি দল মনে করে যেভাবেই হোক নিজের দলের মানুষকে প্রধান উপদেষ্টা করে নিজের নির্বাচন কমিশনার দিয়ে নিজের প্রশাসনের উপস্থিতিতে নির্বাচন করাবে, তাহলে যে কেউ সেখানে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেতে শুরু করবে। আমার মনে হয় সেটাই এখানে ঘটতে শুরু করেছে।

দলীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করতে পারে না বলে এই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি করা হয়েছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা কূটকৌশলে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ঘুরেফিরে একজন দলীয় মানুষই হয়ে গেলেন! নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই বিষয়টি আর এখানে থাকল না। ১০ জন উপদেষ্টার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমি তাদের ভেতর থেকে শুধু একজনকে খুব ভালো করে চিনি, তিনি হচ্ছেন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। আমাদের অনুরোধে এই মুক্তিযোদ্ধা ছোট বাচ্চাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে রাত জেগে জেগে আমাদের সঙ্গে গিয়েছেন। তার বিশ্বাস, আদর্শ আর ক্ষমতার ওপর আমার অবিচল আস্থা, অন্য উপদেষ্টাদের সবাই যদি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের মতো হয়ে থাকলে তাহলে আমি বিশাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। আমি এখানে সেই নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না, যেভাবে দপ্তরগুলো ভাগ করা হচ্ছে সেটা দেখে মনে হচ্ছে না উপদেষ্টাদের সত্যিকার ক্ষমতা ব্যবহার করার কোনো আন্তরিক ইচ্ছে আছে। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো আবার রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে। তিনি ঘটনাক্রমে রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন, বাংলাদেশের মতো একটি দেশের এ রকম জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা তার নেই, দক্ষ উপদেষ্টাদের সেই দায়িত্ব দিয়ে তবুও হয়তো শেষ রক্ষা করা যায়, তিনি তার চেষ্টা করছেন না। আমার মনে হয় হাইকমান্ড থেকে তাকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি মুখ বুজে সেই নির্দেশ মেনে যাচ্ছেন। খুব আনন্দে মানছেন তা নয় তাই তার মুখ এত বিমর্ষ, তিনি এত অসুখী।

নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অদক্ষ নির্বাচন কমিশার এখনো রয়ে গেছেন। কয়েক দিন তার দিকে নজর দেওয়া হয়নি, এখন যখন সবাই আবার তার দিকে তাকিয়েছে

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে তার মনে ফুরফুরে এক ধরনের আনন্দ। তিনি গুনগুন করে কবিতার ছন্দে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, টেলিভিশনে বাংলা নাটকের জন্য অপূর্ব একটি সংলাপ হতে পারে কিন্তু দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে এর মূল্য কতটুকু। বিশাল একটা ভুয়া ভোটার লিস্ট নিয়ে দলীয় একজন নির্বাচন কমিশনার তার আরও কিছু দলীয় সহযোগী নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, নিরপেক্ষ একটা নির্বাচনে তাদের কোনো আগ্রহ নেই– এ রকম অবস্থায় কী হবে কেউ বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না। বিমর্ষ এবং অসুখী রাষ্ট্রপতি এই ফুরফুরে মেজাজের নির্বাচন কমিশনারকে যদি তার অবস্থান থেকে উৎপাটন করতে পারেন তাহলে হয়তো কেউ কেউ তাকে খানিকটা বিশ্বাস করা শুরু করতে পারবেন, তাও খুব সতর্কভাবে।

কাজেই দেশের মানুষের এখন একটা নতুন উপলব্ধি হতে শুরু করেছে। সবাই আশা করেছিল নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন, ভোটের দিন একজন ভোটার শুধু সেজেগুজে উৎসবের আমেজে ঘর থেকে বের হয়ে তার ভোটটা দিয়ে আসবে। এখন আর সেই অবস্থা নেই, একজন ভোটারকে শুধু ভোট দিয়ে এলে হবে না, তাকে এখন ভোট কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে তার দেওয়া ভোটটি সঠিক জায়গায় গিয়েছে কি না, সেই ভোট সঠিকভাবে গোনা হয়েছে কি না, সঠিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে কি না! এই দেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের নির্বাচন।

২

সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, কিছুদিন আগে হঠাৎ করে আমাদের রাষ্ট্রপতি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাকে তাড়াহুড়ো করে সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়েছিল। ফিরে আসার পর তাকে সিএমএইচ-এ আটকে রাখা হলো। তিনি আবার বঙ্গভবনে ঢুকতে পারবেন বলে মনে হচ্ছিল না, অধ্যাপক বি. চৌধুরীর অপসারণ প্রক্রিয়াটি থেকে অল্প একটু বেশি সম্মানজনক প্রক্রিয়া! সেই সময়কার বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা তখন অনেক বাগবিতণ্ডা, হইচই করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে বঙ্গভবনে সম্মানজনকভাবে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের অসুখী রাষ্ট্রপতির সেই কথাটার কথা মনে আছে কি না জানি না, সেটা নিয়ে কখনো তার বিবেকে দংশন হয় কি না সেটাও কখনো জানতে পারব না।

BanglaBook.org

৩

এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিছুদিন আগে বাসে করে সিলেট যাচ্ছি, মাঝখানে একটু যাত্রাবিরতি হয়েছে। আমি হাঁটাহাঁটি করছি, তখন একজন আমার কাছে এগিয়ে এলেন, ভদ্রতার দু-একটি কথা বলে তিন বললেন, 'আওয়ামী লীগের একেবারে শেষ দিকে আপনি 'শূন্য দিয়ে গুণ' নামে একটি কলাম লিখেছিলেন মনে আছে?'

আমার স্মৃতিশক্তি ভালো নয় কিন্তু নানা কারণে এই লেখাটির কথা মনে ছিল। আওয়ামী লীগের আমলে পার্বত্য শান্তি চুক্তি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গঙ্গার পানি চুক্তি, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা– এ রকম অনেক বড় অর্জনের পরও তাদের শাসনের শেষ সময়ে দেখা গেল সাধারণ মানুষ এসব কিছু মনে রাখেনি, তাদের মনে আছে শুধু দলীয় মাস্তানদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডটুকু! আমি বলেছিলাম ব্যাপারটা ছিল, বিশাল একটা সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করে ফেলার মতো। যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক তারা আমার সেই লেখা পড়ে আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। আজকে আমাকে যিনি প্রশ্ন করছেন, তিনিও সম্ভবত আওয়ামী লীগের সমর্থক। তার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সে রকম একটি কলাম লিখেছিলাম।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এখন বিএনপির শেষ সময় চলে এসেছে, আমার খুব ইচ্ছা আপনি এদেরকে নিয়ে একটি কলাম লিখেন।'

আমি একটু থতমত খেয়ে তাকে সে রকম একটা কিছু লেখার জন্য কথা দিয়েছিলাম। বিএনপি এবং জামায়াত এখন আর ক্ষমতায় নেই, যে কারণেই হোক, আমি সময়মতো সেই লেখাটি লিখতে পারিনি! এখন লিখলে তার সে রকম গুরুত্ব থাকবে বলে মনে হয় না, তাই এই শাসনামলে আমার একেবারে নিজের একটা কথা বলে শেষ করি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিপরায়ণ একজন ভাইস চ্যান্সেলরের কারণে খুব বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিন মিলে চ্যান্সেলরকে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন এই ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ করে নতুন একজন ভাইস চ্যান্সেলরকে নিয়োগ দিতে। (চ্যান্সেলর সেটি করেননি, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ দেখার ক্ষমতাও

BanglaBook.org

তার ছিল না, দেশের ভালো-মন্দ কীভাবে তিনি দেখবেন)। যাই হোক, আমরা নতুন একজন ভাইস চ্যান্সেলরের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। একটা সময় ছিল যখন আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হবেন 'নির্দলীয় স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষাবিদ' কিছুদিন পর সেই স্বপ্ন কাটছাঁট হয়ে গেল, আমরা তখন স্বপ্ন দেখি 'স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষাবিদ'। তারপর সেটা আরও ছোট হয়ে, গেল শুধু শিক্ষাবিদ।'

এখন আমরা ভয়ে ভয়ে বলি, যেকোনো মানুষই আসুক ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে, মানুষটি চোর না হলেই হলো।

জোট সরকার গত পাঁচ বছরে আমাদের এ রকম একটা উপলব্ধি উপহার দিয়েছে, অন্যেরা তার থেকে বেশি কিছু পেয়েছে কি না আমার জানা নেই।

প্রথম আলো
৩ নভেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

আমাদের উৎসব আমাদের অধিকার

বারো তারিখ রাতের বেলা আমার পরিচিত মানুষেরা আমাকে ফোন করে জানতে শুরু করল যে বাংলাদেশে মিলিটারি নামানো হয়েছে। সারাটা দিন আমার বুকটা ধুকপুক করেছে, যার সঙ্গেই কথা হয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করেছি দেশে কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে কি না- সবাই বলেছে না কোথাও কোনো গোলমাল নেই, শান্তিপূর্ণ অবস্থা, লাঠিসোটা নেই, মারামারি নেই। তারপরও যখন শুনতে পেলাম দেশে মিলিটারি নামানো হয়েছে, দুঃখে আমার বুকটা প্রায় ভেঙে গেল। অন্য সবাই তখন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কোনো গোলমাল নেই, ঝামেলা নেই তাহলে হঠাৎ করে মিলিটারি কেন নামানো হলো? আমি একবারও কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করিনি, কারণ এর মাঝে তো গোপন কিছু নেই। অসুস্থ দুর্বল অক্ষম একজন রাষ্ট্রপতি ডজনখানেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় নিয়ে বসে আছেন, তার আশপাশে থাকে চারদলীয় জোটের লোকজন, এর মাঝে তিনি ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। বিটিভির খবর বা অনুষ্ঠানে কোনো পরিবর্তন হয়নি, আসল বিষয়টা বুঝতে তো কাউকে আইনস্টাইন হতে হয় না। কাজেই অসুস্থ দুর্বল অক্ষম রাষ্ট্রপতিকে 'ওপর' থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মিলিটারি নামানোর জন্যে; তিনি সেই নির্দেশ মোতাবেক মিলিটারি নামিয়ে দিয়েছেন! বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের মতো আমিও গভীর দুঃখে বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে ছিলাম। যত নড়বড়েই হোক না কেন, দেশে তবুও তো একটা গণতন্ত্র ছিল, সেটাও কি তাহলে চলে যাচ্ছে?

মাঝরাতে আবার আমার কাছে টেলিফোন এসেছে (আমি টেলিভিশন দেখতে পাই না বলে টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখালেই আমার মা থেকে শুরু করে আরও অনেকে ফোন করে খবরটা আমাকে জানিয়ে দেয়)। তাদের কাছে আমি জানতে পারলাম টেলিভিশনে বলেছে, আসলে মিলিটারি নামিয়ে দেওয়া হয়নি। খবরটি ভুল ছিল। এত বড় একটা খবর কীভাবে ভুল থাকে সেটা নিয়ে একবারও

BanglaBook.org

আমি মাথা ঘামালাম না– কারণ আমার বুক থেকে বিশাল একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল। দেশে মিলিটারি নেমেছে এই খবর শুনে মন খারাপ করে যারা ঘুমিয়ে গিয়েছিল আমি তাদের ঘুম থেকে তুলে তুলে নতুন খবরটা দিলাম, কাঁচা ঘুম ভাঙানোর জন্য তাদের কেউ আমার ওপর এতটুকু বিরক্ত হলেন না।

আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে আমরা এখন সেটা খুঁটিনাটি জানতে পেরেছি। আমরা যা অনুমান করছিলাম একেবারে হুবহু সেটা ঘটেছে। পত্রিকার সম্পাদকেরা খুব গুছিয়ে সেগুলো লিখেন, আমরা সাধারণ পাবলিক এত গুছিয়ে সেগুলো বুঝতেও পারি না, লিখতেও পারি না। সাদা চোখে আমাদের যেটা ধরা পড়ে আমরা সেটাই বলি, সেটা হচ্ছে যে এই দেশটাকে গত পাঁচ বছর যারা পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে দেখে এসেছেন এখনো তাই দেখছেন! ওপরের থেকে নির্দেশ এসেছে, সেই নির্দেশে অসুস্থ দুর্বল অক্ষম প্রেসিডেন্ট এবং চারদলীয় জোটের আজ্ঞাবহ স্বরাষ্ট্র সচিব মিলিটারি ডেকে বসে আছেন। পুরো কাজটা করা হয়েছে গোপনে। পত্রিকার সম্পাদকেরা ভদ্র ভাষায় সেটাকে বলছেন 'বিতর্কিত' বা 'ভুল'। আমরা সাধারণ পাবলিক জানি এর মাঝে কোনো বিতর্ক নেই, ভুল নেই, এটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে নেওয়া ষড়যন্ত্রের একটা ধাপ। এর মাঝে অনেক ধাক্কা আমরা পার হয়ে এসেছি, একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় আসলে আরও আসছে!

তবে এই ধাক্কাটায় আমাদের একটা লাভ হয়েছে, হঠাৎ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের ওপর আমাদের বিশ্বাস বেড়ে গেছে। এত বড় একটা ষড়যন্ত্র তারা ঠেকিয়ে দিতে পেরেছেন, সেটি কম কথা নয়। এতদিনে আমরা সবাই বুঝে গেছি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছলেবলে কৌশলে নানা ষড়যন্ত্র করে যাবেন (এই দেশে কি একজন মানুষও আছে যে বিশ্বাস করে এই অসুস্থ দুর্বল এবং অক্ষম মানুষটি এক ডজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন?) এবং আমাদের ১০ জন উপদেষ্টা সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করবেন। মিলিটারি নামিয়ে দেওয়ার এই ষড়যন্ত্রটি তারা যেভাবে ঠেকিয়েছেন সেটা জানার পর আমি একেবারে বুকের ভেতর থেকে তাদের জন্য দোয়া করেছি। আসলে কী আছে আমরা জানি না, কিন্তু এই দেশের ভয়াবহ দুর্যোগের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই ১০ জন উপদেষ্টা যে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কীভাবে কীভাবে

BanglaBook.org

বিশ্বাসটুকু আমার ভেতরে গড়ে উঠেছে। দেশের এত রকম ঝামেলার মাঝেও তারা যে যশোরের ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধ মানুষের কথা মনে রেখেছেন, তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি একটা সমাধানের চেষ্টা করছেন সেটা জানতে পেরেই আমার বুকটা ভরে গেছে! এই দেশের মানুষ কত কষ্টে আছে কেউ তাদের পাশে ছিল না, এখন দেশের সরকার তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, কী চমৎকার একটা ব্যাপার! আমরা জানি এই দেশে অনেক কূটকৌশল হয়, অনেক ষড়যন্ত্র হয়, তারপরও এই দেশটা টিকে আছে কারণ এই দেশে অনেক খাঁটি মানুষ আছেন। ১০জন খাঁটি মানুষের একটা দল দেশের মহাবিপদের সময় দেশের মানুষের পাশে আছেন চিন্তা করে আমি হঠাৎ বুকের ভেতর একটা জোর পাচ্ছি। আগামী তিন মাস প্রতিদিন আমি মনে মনে তাদের জন্য দোয়া করে যাব।

২

অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি আমার পরিচিত অনেকের কাছ থেকে ক্রুদ্ধ টেলিফোন পেতে শুরু করেছি। তাদের কেউ কেউ বলছে, 'স্যার, আপনি যদি আর কখনো এনটিভিতে ঈদের নাটক লিখেন তাহলে কিন্তু ভালো হবে না!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন কী হয়েছে?' তারা বলল, 'আপনি দেখেছেন, তারা কী করছে?'

আমি খোঁজখবর নিতে শুরু করে আবিষ্কার করেছি যে সবাই অনেক দিন থেকে যে বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল এখন সেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছে। আমাদের দেশের অনেকগুলো প্রাইভেট চ্যানেল এবং তার বেশিরভাগের মালিক হচ্ছেন চারদলীয় জোটের নেতারা। এতদিন এই চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান, নাটক, খবরে আলাদা করে কিছু চোখে পড়েনি। ইদানীং চোখে পড়ছে– চ্যানেলগুলোর মালিকদের দলের এখন দুঃসময়, এখন নিরপেক্ষতার জটিলতা ছেড়ে দলের পাশে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। চ্যানেলগুলো ধীরে ধীরে তাদের দলের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, খবরগুলো দেখলেই সেটা বোঝা যায়। এনটিভি, আরটিভি, চ্যানেল ওয়ান হঠাৎ করে আর নিরপেক্ষ চ্যানেল নয়, দলের চ্যানেল। যতদিন যাবে তারা আরও দলের চ্যানেল হতে থাকবে।

তবে আমার ধারণা, বাংলাদেশের মানুষের এক ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই থাকে, যেই মুহূর্তে তারা একটা খবরের কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেলে একটা দলীয় আনুগত্যের গন্ধ পায়, সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটাকে পরিত্যাগ করে– এনটিভি

BanglaBook.org

চ্যানেলে নাটকটা দেখে সবাই দ্রুত চ্যানেল পরিবর্তন করে এটিএন কিংবা চ্যানেল আইয়ে চলে যাবে খবর শোনার জন্য!

আমি তার সঙ্গে সঙ্গে একুশে টিভির জন্যও অপেক্ষা করে আছি– তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি এই চমৎকার চ্যানেলটাকে রাহুমুক্ত করে আমাদের উপহার দিতে পারে না?

৩

খবরের কাগজের অনেক খবর আমি ভালো বুঝতে পারি না, কিন্তু একটা খবর আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিইসি আজিজকে বয়কট করবেন। শুধু যে বয়কট করবেন তা নয়, তারা সিইসি আজিজের স্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবেন তার স্বামীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এই যন্ত্রণার ভেতর থেকে দেশটাকে উদ্ধার করতে!

আমার নিজেরও মাথায় মাঝে মধ্যে এ রকম একটা চিন্তা ঘুরঘুর করে, সিইসি আজিজ শুধু যে একজন নির্বাচন কমিশনার তা তো নন, তিনি নিশ্চয়ই কারও স্বামী, কারও বাবা, কারও মামা এবং চাচা। তিনি যখন সারা দিন তার অফিসে বসে নানা ধরনের গোঁয়ার্তুমি করে বাসায় ফিরে যান তখন কি তার স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের মুখোমুখি হতে হয় না? তার সন্তানেরা যখন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন 'বাবা তুমি মিথ্যা কথা কেন বলেছ?' তখন তিনি কী উত্তর দেন? কিংবা তার স্ত্রী যদি জিজ্ঞেস করেন, 'কাঁচা বাজার থেকে যদি আমি আর সবজি কিনতে না পারি, মাছ-মাংস কিনতে না পারি, তখন কী হবে?' তখন কি সিইসি আজিজ তার স্ত্রীর কাছে সংবিধানের কথা বলেন? আমাদের বাংলাদেশে কি এর আগে একজন মানুষকে নিয়ে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য, এত কৌতুক, এত রগড় হয়েছে? তিনি কি সেটা বুঝতে পারছেন না? তিনি কি কখনো খবরের কাগজ পড়েন না?

আমার ধারণা, ইদানীং বাংলাদেশে যত শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের কোনো বাবা-মা তাদের সন্তানের নাম আজিজ রাখবেন না! সিইসি আজিজ এই দেশের মানুষের সম্ভাব্য নামের তালিকা থেকে একটি নাম কমিয়ে দিলেন– এটা কিন্তু খুব ছোট ব্যাপার নয়।

BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন আগে ১৪ দল প্রথমবার যখন 'নির্বাচনী সংস্কার'-এর কথা বলেছিল, আমার ধারণা দেশের মানুষ তখন সেই কথাটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। রাজনীতিবিদেরা নানা ধরনের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অনেক ধরনের বাড়াবাড়ি করে থাকেন, 'নির্বাচনী সংস্কার' বিষয়টাকে সে রকম কিছু একটা ধরে নিয়েছিল।

এখন বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম। নির্বাচনী সংস্কার মোটামুটি একটা কঠিন শব্দ, চট করে তার অর্থটা কেউ ধরতে পারে না। সেই তুলনায় 'সিইসি আজিজ' শব্দটা অনেক সহজ, এই মানুষটির কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি সবকিছু দেশের মানুষের জন্য বোঝা খুব সহজ। হঠাৎ করে দেশের মানুষ 'নির্বাচনী সংস্কার' নামক কঠিন শব্দটার অর্থ বুঝতে পেরেছে। এর অর্থ সিইসি আজিজ নামক মানুষটাকে সরিয়ে তারপর নির্বাচন করা– এ ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি নেই। তারা অনেক দিন থেকে দেখে এসেছে এই মানুষটি বহুদিন থেকে টালবাহানা করে আসছেন। ভোটার তালিকা নিয়ে ঘোট পাকিয়েছেন, হাইকোর্ট তাকে শাসিয়ে রেখেছেন, অর্থমন্ত্রী টাকা আটকে রেখেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে এলে কোমরে বেল্ট লাগিয়ে অসুস্থ হওয়ার ভান করে পালিয়ে বেড়ান, বিএনপির মন্ত্রীরাই এক সময় তার প্রসঙ্গে হতাশ হয়ে মাথা নেড়েছেন। শুধু তা-ই নয়, একেবারে প্রকাশ্যে মিথ্যা কথা বলে ধরা পড়ে গেছেন। একটা দেশে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ পদে এ রকম একজন মানুষ থাকতে পারে সেটাই বিশ্বাস করা কঠিন। দেশের একজন মানুষও নেই যিনি সিইসি আজিজের ওপর বিশ্বাস আছে– তা না হলে কখনো কি একটা দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে শুক্রবারে জুমার নামাজের পর বিশেষ দোয়া করা হবে– যেন সিইসি আজিজের মনটা একটু নরম হয়, তিনি পদত্যাগ করে দেশকে রক্ষা করেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, চারদলীয় জোট হঠাৎ করে সিইসি আজিজের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা যেভাবে পারেন এই মানুষটিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রাখতে চান। এই দেশের যেসব মানুষ রাজনীতিতে মোটামুটি বীতশ্রদ্ধ, সবকিছুকেই দুই প্রধান দলের ক্ষমতায় যাওয়ার একটা প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখেন তারা পর্যন্ত ভুরু কুঁচকে বলতে শুরু করলেন, চারদলীয় জোট এই

BanglaBook.org

মানুষটির জন্য এত পাগল হলো কেন? তাহলে কি আসলেই ডাল মে কুছ কালা হ্যায়? যতই দিন যাচ্ছে, এবং চারদলীয় জোট যতই সংবিধানের কথা বলে সিইসি আজিজের পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। খুব সহজ প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে। অবাধ নির্বাচন তো যেকোনো খাঁটি মানুষের অধীনেই করা যায়– চারদলীয় জোট কেন সিইসি আজিজ ছাড়া অন্য কারও অধীনে নির্বাচন করতে চায় না? তাহলে কি ১৪ দলের সন্দেহ সত্যি? এই মানুষটি তাহলে আসলেই একটা ষড়যন্ত্রের গুটি?

১৪ দলের এত বড় অবরোধ, মানুষের এত ভোগান্তি, এত কষ্ট, কিন্তু তারপরও সিইসি আজিজ পদত্যাগ না করে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন– মানুষের সন্দেহ আরও বেড়েই চলেছে। নির্বাচনের এখন অনেক দেরি, কিন্তু এর মাঝেই সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে অবাধ একটা নির্বাচন হলে চারদলীয় জোটের জিতে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই তারা সিইসি আজিজকে রেখে ভোটের নামে একটা জুয়াচুরি করার জন্য পরিকল্পনা করছে! এই কথাটা এখন আর ১৪ দলের মনের কথা নয়, এটা সাধারণ মানুষের মনের কথা।

আসলে কী হবে আমরা জানি না। এই দেশের রাজনীতি খুব কঠিন বস্তু– আমার ধারণা আসলে কী হবে, সেটা বড় বড় রাজনীতিবিদরাও জানেন না। আমি শুধু দুটো জিনিস জানি, এক. এই দেশের মানুষ ভোট দিতে খুব পছন্দ করে। যত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাই থাকুক না কেন, ভোটের দিন সবাই সেজে-গুজে ভোট দিতে আসবে, এটা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। দুই. এই দেশের মানুষ ভোট দিতে গিয়ে একবারও ভুল করেনি!

আমাদের দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় উৎসবটি ঠিকভাবে হবে না সেটা তো হতে পারে না। মানুষ কতদিন থেকে অপেক্ষা করে আছে– রিকশা চালানোর জন্য সেই রংপুর থেকে সিলেটে যে মানুষটি এসেছে, সেই মানুষটিও তো ভোটের দিন বাড়ি যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে! দেশের একেবারে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটুকুও ভালো করে জানে না, তারাই কিন্তু এই দেশের গণতন্ত্রটাকে ধরে রেখেছে। অথচ এই দেশের বড় বড় জ্ঞানী গুণী মানুষ, ক্ষমতাশালী মানুষ সেই সাধারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসবটিকে ঠিক করে আয়োজন করতে দেবে না সেটা তো কিছুতেই হতে পারে না।

দেশে একটা দীর্ঘ অবরোধ চলছে, পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশে এ রকম

BanglaBook.org

একটি অবস্থা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এই দেশের মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে সেটা সহ্য করছে। কয়েক দিনের জন্য সেটা তোলা হয়েছে, সারা দেশের মানুষের সঙ্গে আমিও আশা করে আছি এটা আর ফিরিয়ে আনতে হবে না। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মাঝে মাত্র দু'একটি মানুষ গোয়ার্তুমি করবেন আর সেজন্য সেই ১৪ কোটি মানুষ কষ্ট পাবেন সেটা তো হতে পারে না।

আমার ভেতরে কোথায় জানি একটা বিশ্বাস আছে যে এই দেশের এতগুলো মানুষের সবচেয়ে বড় উৎসবটি শেষ পর্যন্ত ঠিকভাবে হবে। মানুষজন সেজেগুজে যাবে ভোট দিতে– আমরা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা যে গণতন্ত্রের জন্য কিছু করতে পারিনি, সাধারণ মানুষেরা সেই গণতন্ত্রটাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে। আগে যেভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারও সেভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এবং আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাব সামনের দিকে।

প্রথম আলো
১৭ নভেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

গণতন্ত্রের জন্ম-প্রক্রিয়া

একাত্তরে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল আমরা তখন ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি আমাদের আর কখনো আন্দোলন করতে হবে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের শত্রুর হাত থেকে দেশ মুক্ত করে তাঁদের চিরতরে খেদিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের যা কিছু সংগ্রাম তার সব হবে দেশের মানুষের জন্য।

অথচ কী আশ্চর্য, ৩৫ বছর পরেও দেশের মানুষকে রাস্তায় আন্দোলন করতে হয়, মাঝেমধ্যে ভাবতে খুব অবাক লাগে যে দেশের কিছু মানুষ দেশের জন্য কিছু মানুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এটা কেমন করে হয়ে গেল?

হয়ে যখন গেছে এটাকে আমাদের গলাধঃকরণ করতে হবে, লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে যে দেশের সাধারণ মানুষ রাজনীতির ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে। আমার মনে হয় সবাই কখনও না কখনও কাউকে না কাউকে বলতে শুনেছেন, 'ধুর! এরা পলিটিক্স করে শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য।' মানুষজন খুব সহজেই কথাগুলো বলে ফেলে কিন্তু এর মধ্যে একটা খুব বড় বিপদের আশঙ্কা আছে, সত্যি সত্যি যদি তাঁরা এটা বিশ্বাস করে বসে থাকে তাহলে কোনো এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখব রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারির গাড়ি টহল দিচ্ছে, পাকিস্তান বা থাইল্যান্ডের মতো দেশে মার্শল ল' চলে এসেছে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর এই মহাবিপদটুকু একেবারে আমাদের কানের কাছে দিয়ে গেছে, ব্যাপারটা চিন্তা করলেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই দেশের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষকেরা নানা ধরনের অপকর্ম করেন, প্রাইভেট পড়ান, কোচিং পড়ান, দলবাজি করেন এবং সে কারণে দেশের মানুষ যদি কখনো ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে, 'ধুর! শিক্ষকেরা কোনো কাজের না– স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিই', তাহলে যে ব্যাপারটা হবে রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে বিদায় করে দিলে ঠিক সেই ব্যাপারটা হবে। তাই আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেক সেকেণ্ডে মনে মনে জপ করতে হবে, 'যত অসহ্যই মনে হোক এই দেশে রাজনীতিটা টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ এ ছাড়া কোনো গতি নেই।'

BanglaBook.org

এই দেশে দুর্নীতি যেভাবে একটা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার জন্য কিন্তু শুধু রাজনীতিবিদেরা দায়ী নন, তার জন্য আমলারাও দায়ী। কিন্তু কীভাবে-কীভাবে জানি দোষটুকু এসে পড়ে শুধু রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে। আমার মনে হয় অনেক জায়গায় রাজনীতিবিদ থেকে অনেক বড় দুর্বৃত্ত এই আমলারা, কিন্তু সামাজিকভাবে তাঁরা কীভাবে-কীভাবে জানি পার পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টা এবারে আমি একেবারে নিজের চোখে দেখেছি। রাজনৈতিক নেতারা খুঁজে-পেতে একেবারে চরম দুর্নীতিবাজ একজন মানুষকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর বানিয়ে তাঁদের দায়িত্ব শেষ করলেন। রাজনৈতিক নেতাদের অপরাধ সেখানেই শেষ বাকিটুকু আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু। এমন কোনো দুর্নীতি বা অপরাধ নেই, যেটা তিনি করেননি। সেটা করার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছু 'আমলা' এবং কিছু শিক্ষক জুটিয়ে নিলেন এবং দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা জায়গাকে আঁস্তাকুড় থেকেও খারাপ জায়গায় পাল্টে দিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের যত দোষ তার চেয়ে অনেক বেশি দোষ এই আমলা কিংবা আমলা ধরনের মানুষগুলোর।

কাজেই আমার মনে হয় সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বিষয়গুলো দেখানোর সময় এসেছে। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের সংবাদপত্রগুলো স্বাধীন, যেটা বলতে চায় সেটা বলে ফেলে। তার জন্য যে মূল্য দিতে হয়নি তা নয়– এই দেশে সবচেয়ে বিপদের মধ্যে থাকেন সাংবাদিকেরা। কখনও কখনও যে সাংবাদিকেরা বাড়াবাড়ি করেন না তা নয়, কিন্তু তারপরেও দেশের সত্যিকারের খবরটা পাওয়া যায়। সেই তুলনায় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বেশ সতর্ক। মালিকেরা রাজনৈতিক দল করেন বলে বেশির ভাগ চ্যানেলের এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে– খবর শুনলেই বলে দেওয়া যায় এটি কোন চ্যানেল, তাঁদের মালিকদের ঘুরে-ফিরে অবধারিতভাবে সেখানে দেখা যায়!

যেহেতু রাজনীতিটা রাখতেই হবে, গণতন্ত্রের জন্য তাই সেটাকে পরিষ্কার করা ছাড়া কোনো গতি নেই। সেটা কীভাবে হবে, সেটা আমরা সবাই ভাসা ভাসা ভাবে জানি। চানাচুর কিংবা গাড়ির ব্যবসায়ীদের নির্বাচন করতে না দিয়ে যাঁরা সারা জীবন পথে-ঘাটে রাজনীতি করেছেন, তাঁদের নির্বাচন করতে দিলেই এক লাফে আমাদের রাজনীতি অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্বাচনের সময় তাঁরা যে টাকাপয়সা খরচ করেন সেগুলো হালাল উপার্জন কি-না সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই রাজনীতি আরও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাঁরা ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি করেন তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে আমরা আরও কয়েক ধাপ

BanglaBook.org

এগিয়ে যাব। বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা, গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে– অনেকেই আজকাল সেগুলো নিয়ে কথা বলছেন। কবে সেটা সত্যি সত্যি ঘটবে আমরা এখনো জানি না, কিন্তু এগুলো ঘটানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে সেগুলো দাবি করা, অন্তত সেটুকু তো ঘটতে শুরু করেছে।

একাত্তরে একটা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই যুদ্ধ করে পাওয়া দেশটা যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, দেশটা সেভাবে অগ্রসর হয়নি। একটা সময় ছিল যখন সেটা নিয়ে আমার মনে এক ধরনের হতাশা ছিল, কিন্তু যখন পৃথিবীর ইতিহাস পড়তে শুরু করেছি, সেখানে দেখেছি এটাই পৃথিবীর নিয়ম। একটা অর্জন করা যত কঠিন, ধরে রাখা তার চেয়েও কঠিন। আমরা অর্জন করার ত্যাগটুকু স্বীকার করেছি, ধরে রাখার ত্যাগটুকু স্বীকার করিনি! তার মূল্যটুকু দিতে শুরু করেছি।

আমার ধারণা, এর মধ্যে কোনো শটকাট নেই। গণতন্ত্র এক ধরনের ট্যাবলেট নয় যে আমরা এক গ্লাস পানি দিয়ে সবাইকে খাইয়ে দেব। জোর করে চাপিয়ে যে দেওয়া যায় না তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক্সপেরিমেন্টটা আমেরিকা আর ব্রিটেন করছে ইরাকে! বিষয়টা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। পাকিস্তান বা থাইল্যান্ডের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য কষ্ট করতে রাজি নয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই গণতন্ত্রের জন্য এই দেশের মানুষ তাঁদের ত্যাগটুকু স্বীকার করবে। আমাদের কষ্ট হবে, যন্ত্রণা হবে মাঝেমধ্যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাব, কিন্তু তারপরও আমরা দাঁতে দাঁত চেপে গণতন্ত্রটাকে ধরে রাখব। কারণ এর চেয়ে ভালো কোনো পথ এখনো কেউ খুঁজে পায়নি।

একটা সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়াটি খুব ভয়ঙ্কর, মা তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেন, সন্তান যখন জন্ম নেয় তার শরীরে রক্ত-ক্লেদ লেগে থাকে। নাড়ি কেটে প্লেসেন্টাকে মুক্ত করতে হয়। সবকিছু শেষে নবজাতককে ধুয়ে-মুছে যখন মায়ের বুকে দেওয়া হয় তখন পৃথিবীর মধ্যে সেটি হয় সবচেয়ে সুন্দর এটি দৃশ্য। আমার কেন জানি মনে হয় আমাদের দেশ-মাতৃকার গর্ভ থেকে গণতন্ত্র জন্ম নিচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দেশ এখন চিৎকার করছে। গণতন্ত্র যখন জন্ম নেবে, অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু কেটে সরিয়ে যখন এটাকে আমরা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে আমাদের দেশের হাতে তুলে দেব, তখন সেটি হবে স্বাধীনতার পর আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।

প্রথম আলো
২৭ নভেম্বর, ২০০৬

BanglaBook.org

আমি শুধু একটা জিনিসই বুঝি

আহমদ ছফা একবার বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ যখন জেতে তখন সে একা জেতে, কিন্তু সে যখন হারে তার সঙ্গে সবাই হারে। অত্যন্ত সত্য কথা, একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ যদি একা ওভাবে দেশ শাসন করার দায়দায়িত্ব নিয়ে না নিত তাহলে মাত্র চার বছরের ভেতরেই খালেদা জিয়ার জন্মদিনের উৎসব পালন করার জন্য ১৫ আগস্ট তৈরি হতো না। ১৫ আগস্টের সেই ধাক্কা বাংলাদেশ কি এখনো সামলে উঠতে পেরেছে? আওয়ামী লীগের সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাংলাদেশ কি তখন হেরে যায়নি?

আহমদ ছফা এখন বেঁচে নেই (আহা! আমি এই খ্যাপা মানুষটার অভাব খুব অনুভব করি) তিনি বেঁচে থাকলে এখন কী বলতেন কে জানে? হয়তো তাঁর আগের বাক্যটি একটু পরিবর্তন করে বলতেন, আওয়ামী লীগ যখন জেতে তখন জেতে শুধু তাদের নেতারা। যখন হারে তখন হারে শুধু তাঁদের কর্মীরা আর সমর্থকেরা। তা না হলে তাঁদের এত কর্মী আর সমর্থকদের হতাশ আর ক্ষুব্ধ করে আওয়ামী লীগের এক-দুজন বড় নেতা খেলাফত মজলিশের সঙ্গে এ রকম একটা পাঁচ দফা চুক্তি করতে পারে? মৌখিক চুক্তি নয়, রীতিমতো কাগজে লিখে স্বাক্ষর করা চুক্তি?

এই পাঁচ দফার একটি হচ্ছে কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া। জোট সরকার যখন ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন আওয়ামী লীগের একজন বড় নেতা আমাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, আমি যেন এর বিরুদ্ধে একটু লেখালেখি করি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর দল আওয়ামী লীগকে তিনি কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলতে রাজি করাতে পারেননি। আমরা যারা দেশের লেখাপড়ার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করি তারা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছিলাম। যে হতদরিদ্র ছেলেগুলো দেশের আসল সুযোগগুলো গ্রহণ করতে না

BanglaBook.org

পেরে ফ্রি থাকা-খাওয়ার জন্য কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয় তাদের জন্য আমাদের মায়া আছে, আমরা চাই তারা সত্যিকারের লেখাপড়া শিখে জীবন গড়ে তোলার সত্যিকারের সুযোগ পাক, কওমি মাদ্রাসায় মাস্টার্স ডিগ্রি পেয়ে তাদের সামনে বিশাল একটা জগৎ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এ ধরনের কাল্পনিক একটা স্বপ্নে যেন বিশ্বাস না করে। মাস্টার্স পাওয়ার আগে স্নাতক ডিগ্রি পেতে হয়, স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার আগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হয়, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার আগে মাধ্যমিক পাস করতে হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে করা হবে তার বিন্দুমাত্র নিশানা না দিয়ে কেউ যদি হুট করে বলে দেয় এখন থেকে কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রি মাস্টার্সের সমতুল্য– কেউ সেই কথা বিশ্বাস করবে না। আমরা করি না এবং আমরা চাই কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররাও যেন সেটা বিশ্বাস না করে, তাদেরও যেন আশা ভঙ্গ না হয়।

আওয়ামী লীগ কিন্তু সেটা করেছে এবং আমাদের অসম্ভব আশাভঙ্গ হয়েছে। তারা সত্যিই যদি কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে সেটা হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সারা পৃথিবীর সামনে হাস্যস্পদ করে তোলা। আসলে তাদের সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই, পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কিছু মানুষকে ধোকা দিয়ে ভোট ম্যানেজ করার একটা কৌশল মাত্র। তাহলে সেটা হচ্ছে একটা তৃতীয় স্তরের প্রতারণা, এর কোনোটাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

পাঁচ দফার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দফা হচ্ছে ফতোয়া সম্পর্কে। কাগজে-কলমে স্বাক্ষর দিয়ে বলে এসেছেন যে, সার্টিফিকেট পাওয়া মওলানা কিংবা আলেমরা ফতোয়া দিতে পারবেন। (এই সার্টিফিকেটটা কী, কে কাকে কখন কীভাবে দেবে সেই বিষয়টা কিন্তু এখনো কেউ জানে না।) ফতোয়া হচ্ছে আইন, তাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন এই দেশে দুই ধরনের আইন থাকবে। পার্লামেন্টে পাস করা রাষ্ট্রীয় আইন আর 'সার্টিফিকেট' পাওয়া মওলানা এবং আলেমদের আইন! তাদের তৈরি এই আইন বা ফতোয়ার কথা এই দেশের মানুষ বেশ অনেক দিন থেকে জানে। সাধারণত অসহায় মেয়েদের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করা হয়, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ঢিল মেরে হত্যা করার মতো ফতোয়া দেওয়ার ঘটনাও এই দেশে ঘটেছে। আমাদের মতো মানুষদের মুরতাদ ঘোষণা করার কথা প্রায় রুটিনমাফিক কাজ, আমরা তখন কী করব? দেশের এক নম্বর আইন আমাদের রক্ষা করবে, নাকি দুই নম্বর আইন?

খেলাফত মজলিশের সঙ্গে পাঁচ দফা চুক্তি হওয়ার পর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়েছে এই দেশের আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং মুসলমান নন সেরকম

BanglaBook.org

ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা। (না, আমি সংখ্যালঘু শব্দটা ব্যবহার করে তাদের অপমান করব না।) জোট সরকারের এই পুরো পাঁচটি বছর তাদের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা মুক্তবুদ্ধির জায়গায় সবচেয়ে যোগ্য এবং সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাননি। কিন্তু শুধু এই অবিচারগুলোই তাঁদের কপালে ছিল না, তাঁরা আসলে সারাক্ষণ আরও বড় আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন- কখন কিছু দুর্বৃত্ত এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে 'বাঁশখালী' করে দেয়, কম বয়সী মেয়েটিকে তুলে নিয়ে 'পূর্ণিমা' করে দেয়। মনের গভীরে তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই আশা করছিলেন যে এই জোট সরকার বিদায় নিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ একটা সরকার আসবে। তাঁদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল- খেলাফত মজলিশের সঙ্গে পাঁচ দফা চুক্তি করার পর তাঁদের বুক থেকে যে বিশাল দীর্ঘশ্বাস হাহাকারের মতো বের হয়ে এসেছে সেটা কী আওয়ামী লীগের নেতারা শুনেছেন? শুনতে চান?

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের খেলাফত মজলিশের সঙ্গে পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তি হওয়ার পর দেশের মানুষের ভেতরে এক ধরনের ক্ষোভের জন্ম হয়েছে। আওয়ামী লীগের জন্য সমবেদনা আছে, এ রকম মানুষজনও প্রকাশ্যে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই চুক্তিটি বাতিল করার জন্য আওয়ামী লীগের কাছে দাবি জানিয়েছেন। খবরের কাগজে দেখেছি আওয়ামী লীগ তাদের 'ড্যামেজ কৌশল' মিশন শুরু করেছে। 'জলিল সাহেব আগের মতো একটা পাগলামি করে ফেলেছেন' এ রকম হাস্যকর কৈফিয়ত চোখে পড়েছে। কিংবা 'মিডিয়া ছোটখাটো একটা তুচ্ছ বিষয়কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে ফেলেছে' বলে পুরো দোষটা মিডিয়ার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছে। আবার মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনা এত কিছু ঘটার পরও সরল মুখ করে বলেছেন, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে আসেননি, তারা এখনো অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন!

'এক ঘর মে দো পীর' যে রকম থাকতে পারে না ঠিক সে রকম এক রাজনৈতিক দলের পরস্পরবিরোধী দুটি নীতি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। যেকোনো একটা থাকবে, হয় খেলাফত মজলিশকে কথা দেওয়া ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কিংবা আওয়ামী লীগের ঘোষণা দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। এর মধ্যে কোনটা সত্যি, আমাদের জানার আগ্রহ আছে। আমার ধারণা অধিকারও আছে।

BanglaBook.org

২

নাগরিক কমিটির একজন সদস্য হিসেবে গত কয়েক মাস আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেখানকার স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিশাল বিশাল নাগরিক সংলাপে উপস্থিত ছিলাম। সাধারণ মানুষ যখন দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের নিয়ে হা-হুতাশ করতেন তখন আমি তাঁদের একজন রাজনীতিবিদের গল্প শুনাতাম। গল্পটি এ রকম– আমি প্লেনে করে সিলেট থেকে ঢাকা যাচ্ছি, আমার পাশের সিটে বসেছেন একজন সাংসদ। দুজনে গল্প করতে করতে প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্টের বাইরে এসেছি– আমি ধরেই নিয়েছি তার জন্য বিশাল একটা গাড়ি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে, কিন্তু দেখলাম সে রকম কিছু নেই। সেই সাংসদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কীভাবে যাবেন?' আমি বললাম, 'স্কুটারে।' সাংসদ বললেন, 'আমিও স্কুটারে যাব। চলেন যাই।' আমি রীতমতো চমকে উঠলেও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুটারগুলোর সঙ্গে দরদাম করে বললেন, 'নাহ্ এরা খুব বেশি ভাড়া চায়। চলেন এক কাজ করি।' আমি বললাম, 'কী কাজ?' তিনি বললেন, 'একটু হেঁটে এয়ারপোর্ট রোডে চলে যাই, সেখান থেকে স্কুটার নিলে কম ভাড়ায় যাওয়া যাবে।' আমি তখন তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে এয়ারপোর্ট রোডে এসে একটা স্কুটার নিয়েছিলাম।

নাগরিক সংলাপে আমি এই কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে আমাদের দেশেও এ রকম গল্প করার মতো রাজনীতিবিদ আছেন। শুধু তাঁদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমি সেই রাজনীতিবিদের নাম বলতাম না তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে, এ রকম মানুষেরা সাধারণত নিজেরা প্রচার পছন্দ করেন না, 'ভালো মানুষ' সার্টিফিকেটেরও তাঁদের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

আমি এই সাংসদের গল্পটি করেছি তাঁর একটি কারণ আছে। গতকাল খবরের কাগজে দেখেছি আওয়ামী লীগ এই রাজনীতিবিদকে মনোনয়ন দেয়নি। তাঁর বদলে যাকে নির্বাচন দেওয়া হয়েছে তিনি একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, খবরের কাগজের তথ্য অনুযায়ী আফগানিস্তান ফেরত জঙ্গি নেতা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভবনে দেশের গুনীজনদের নাম দেওয়ার সময় এই মানুষটি আমাদের মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে তাঁর মাদ্রাসার ছাত্রদের লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের

BanglaBook.org

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন আমাদের শায়েস্তা করার জন্য। অতীতে তাঁর কারণে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এক ধরনের অসুস্থ কৌতূহল নিয়ে আমি অপেক্ষা করে আছি। আমার দেখার খুব কৌতূহল নির্বাচনে জিতে এসে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে এই মানুষটি আমাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেন! (বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতাম, আমি অনেক দুঃখে তাঁর নামটি নিয়ে এই পরিহাসটুকু করেছি। আমি নিশ্চিত বঙ্গবন্ধু আমাকে ক্ষমা করে দিতেন।)

৩

গত জোট সরকারের আমলে তাদের দৌরাত্ম্য যখন মাঝেমধ্যে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠত তখন আমি মনে মনে ভাবতাম, এমনটি কি হতে পারে না, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে যে কয়টি দল আছে তারা সবাই একত্র হয়ে গেল– এমনকি বিএনপির ভেতরেও আসল যে মুক্তিযোদ্ধারা আছেন তাঁরাও সেখানে চলে এলেন। তারপর সবাই মিলে এই দেশ থেকে স্বাধীনতাবিরোধী, ধর্ম ব্যবসায়ীদের একেবারে সারা জীবনের মতো দেশ ছাড়া করে দিয়ে নতুন একটা বাংলাদেশ তৈরি করা শুরু করে দিলেন। আর লুটপাট নেই, ধর্মের নামে দেশটাকে হাজার বছর পিছিয়ে দেওয়া নেই, দলবাজি নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই, সকল মানুষের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশের জন্য আন্তরিক একটা প্রচেষ্টা। যে দেশের মানুষ এত আত্মত্যাগ করে একটা দেশ পেয়েছেন তাঁরা কি একটা সত্যিকার দেশের স্বপ্ন দেখতে পারেন না?

যখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বামপন্থী দলগুলো তখন আমি আরও একটু আশান্বিত হলাম। সবাই মিলে যখন বড় জোট করল আমার আশা আরেকটু বাড়ল। তারপর হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছি ইনকিলাব গ্রুপ, ইসলামিক ঐক্যজোট এসে জড়ো হয়েছে। আমি যখন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি তখন আরও হৃদয়বিদারক ব্যাপার ঘটেছে। এককালের পতিত স্বৈরশাসক এরশাদকে নিয়ে একেবারে দড়ি টানাটানি খেলা। সেই খেলায় আপাতত জিতেছে ১৪ দল, ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না। রাজনীতিতে যেহেতু আদর্শের কিছু নেই। তখন কে কখন কোথায় যাবে এর পুরোটাই হচ্ছে ভোটের হিসাব, এক ধরনের ব্যবসা। যখন আমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ করে খবর পেয়েছি যে

BanglaBook.org

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খেলাফত মজলিশের সঙ্গে পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তি করে বসে আছেন। গোপন মৌখিক চুক্তি নয়, একেবারে কাগজে-কলমে স্বাক্ষর করে লেখা চুক্তি। এরপর থেকে আমি বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি– আমি এখন শুধু একজন দর্শক!

গত নির্বাচনের সময় আমার পরিচিত একজন আওয়ামী লীগের সমর্থক গ্রামে গিয়েছিল নির্বাচনী প্রচারণা করার জন্য। সে ফিরে আসার পর তার সঙ্গে আমার দেখা, আমি তার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলাম, সে মুখ শুকনো করে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করবেন না কী সমস্যা!' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী সমস্যা?' 'যেখানে গিয়েছি সেখানে সবাই জানে শেখ হাসিনা আসলে হিন্দু!' তার কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'এটা কী করে সম্ভব।' মানুষটি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আপনি জানেন না দেশের কী অবস্থা– এই দেশে সবই সম্ভব। আমরা নির্বাচনের জন্য কাজ কী করব, সত্যি কথাটাই কাউকে বোঝাতে পারি না!'

এই বিষয়গুলো খবরের কাগজে আসে না, তাই আমার জানার কোনো উপায় ছিল না এটা কি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল নাকি প্রচলিত কৌশল। খালেদা জিয়া অবশ্য প্রকাশ্যেই বলতেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে দেশে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে না, শুধু উলুধ্বনি শোনা যাবে– কাজেই বিষয়টা একটা প্রচলিত কৌশল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমার মনে আছে গত নির্বাচনের ঠিক আগে আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পোস্টার ছাপানো হলো। যেখানে শেখ হাসিনার মাথায় হিজাব হাতে তসবি! এবারে পোস্টার না ছাপিয়ে আওয়ামী লীগ হয়তো আরও বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। তারা খেলাফত মজলিশের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করে ফেলেছে। এটা নিয়ে সারা দেশে হইচই এবং সে কারণে আওয়ামী লীগ হয়তো ভেতরে ভেতরে আনন্দিত, তাদের গায়ে ইসলামের গন্ধ লাগানোর কাজটা আর কষ্ট করে পোস্টার ছাপিয়ে করতে হচ্ছে না। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনে বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজই সেটা করে দিচ্ছে। আমার কেন জানি মনে হয়, আওয়ামী লীগের নেতারা ঘরের দরজা বন্ধ করে অট্টহাসি হাসছেন। একজন আরেকজনকে বলছেন, 'এই দু-চারজন শহরের বুদ্ধিজীবীদের চিৎকার চেঁচামেচি নিয়ে মাথা ঘামিও না। ইলেকশনের সময় তারা কি কোনোদিন জামায়াতকে ভোট দেবে? তারা তো আমাদেরই দেবে?' আমি জানি না আমার কাছে মনে হয় যাঁরা আদর্শ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন এটা যেন তাঁদের নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করার মতো একটা ব্যাপার।

BanglaBook.org

আমি রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করি না। আজকাল ঘোষণা দিয়ে বলা হয় 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই', সাদা বাংলায় যার অর্থ 'রাজনীতিতে আদর্শ-ফাদর্শ বলে কিছু নেই, ভোটের জন্য দরকার হলে তোমার মাকেও বিক্রি করে দাও।' আমার ধারণা, এ রকম অবস্থায় রাজনীতিতে বোঝার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আমি শুধু একটা জিনিস বুঝি, সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। আমি জানি, কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম ১৯৭১ সালে এই দেশে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু ভালো যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ– সবকিছু স্বর্গ থেকে এখানে নেমে এসেছিল। এই দেশের সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ পাশাপাশি মাথা উঁচু করে থাকবে, দু'বেলা পেট পুরে খাবে, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে, কেউ শোষণ করবে না, কোনো অবিচার থাকবে না– এ রকম একটা দেশ তৈরি করার জন্য লাখ লাখ মানুষ অকাতরে এখানে প্রাণ দিয়েছিল, আমরা সেই দেশটা পেয়েওছিলাম। এই দেশের যারাই যে রাজনীতিই করুক সেটা কি ঠিক না ভুল সেটা বোঝার আমার একটিই মাপকাঠি সেটি হচ্ছে রাজনীতিটুকু কি মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের পক্ষে না বিপক্ষে? যদি সেটা বিপক্ষে হয় তাহলে সেটা যত চাতুর্যময় কলাকৌশলই হোক না কেন, আমি সেটা কোনোদিন মেনে নেব না। আমি তার বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাব!

আমি শুধু একটা জিনিসই বুঝি, সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের রাজনীতি হোক কিংবা দেশের অস্তিত্বটুকুই হোক তার গোড়ার কথা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ দিয়ে যেটা ছেঁকে বের করে আনা হয়েছে তার চেয়ে খাঁটি আদর্শ আর কী হতে পারে? সেই আদর্শের সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না, যে রাজনৈতিক দল একসময় সেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাও না।

প্রথম আলো
২৯ নভেম্বর, ২০০৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG